আহমেদ রিয়াজ

টুঙ্গিপাড়ার মিয়াভাই

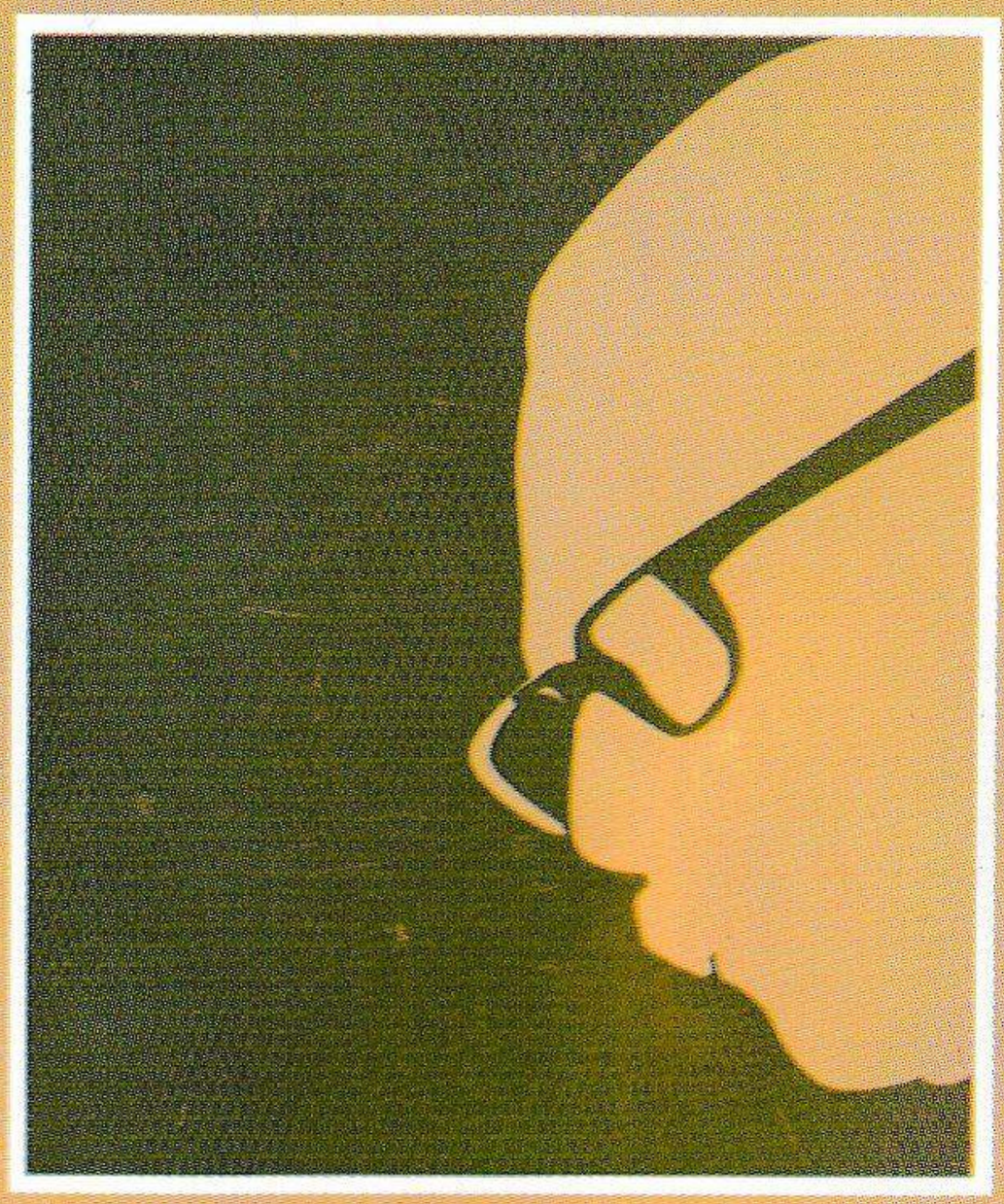

সবগুলো মেঘ তখন তাকায় মানুষসমুদ্রের দিকে। এত উঁচু থেকেও সাগরের কোনো তীর দেখতে পেল না কেউ। যে সাগর ওরা দেখে এসেছে, সে সাগরেরও তো তীর ছিল। এ সাগরের নেই কেন? এক এক করে মানুষ আসছেই, আর বাড়ছে সাগরের পরিধি। তারপর হঠাৎ হইচই শুরু হলো নিচে। ভীষণ শোরগোল। মনে হল সাগরের ঢেউ উত্তাল হয়ে পড়েছে। সেই উত্তাল ঢেউয়ের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন বিশাল এক মানুষ। বিশাল তার ছায়া। সেই ছায়া এসে পড়ল মেঘেদের গায়ে। চমকে ওঠল মেঘেরা। যে সাগরের ঢেউ তারা দেখে এসেছে, এ ঢেউ যে তারচেয়েও বড়!
সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সেই ছোট্টমেঘগুলো, 'আরে! এ তো আমাদের খোকা। আমাদের টুঙ্গিপাড়ার খোকা!'

প্রচ্ছদ ● দেওয়ান আতিকুর রহমান

টুঙ্গিপাড়ার খোকা

টুঙ্গিপাড়ার খোকা

আহমেদ রিয়াজ

ভূমিকা

টুঙ্গিপাড়ার খোকা • আহমেদ রিয়াজ
দ্বিতীয় মুদ্রণ • ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্রথম প্রকাশ • আগস্ট ২০১৬
ভূমিকা • ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯১২ ১৭০৬২৫, ০১৯১১ ২১৭৩৪৭

স্বত্ব লেখক • প্রচ্ছদ দেওয়ান আতিকুর রহমান • অক্ষরবিন্যাস বন্ধু কম্পিউটার্স
• মুদ্রণ নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০
• মূল্য ২০০ টাকা • ISBN : 978 984 904 554 0

উৎসর্গ

আমার কাছে তিনি নক্ষত্রসম। নক্ষত্রদের কাছে যেতে আমার বড্ড ভয় লাগে। কারণ একটাই—যথাযথ শ্রদ্ধা আমি দেখাতে পারব তো!

একদিন তিনি নিজেই ডেকে নিলেন আমাকে। নিজে থেকেই কথা বলতে চাইলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। নক্ষত্রসম মানুষও তবে টিমটিমে কুপির আলোর খবর রাখেন! আর যেদিন তিনি বললেন, আপনার গল্প আমি যেখানেই দেখি, পড়ি। ভালো লাগে। তাঁর কাছ থেকে যে এখনও অনেক কিছু শিখতে চাই আমি। তিনি কি আমায় সে সুযোগ দেবেন?

প্রিয় লেখক, প্রিয় মানুষ—আমার কাছে নক্ষত্রসম মানুষ

সেলিনা হোসেন

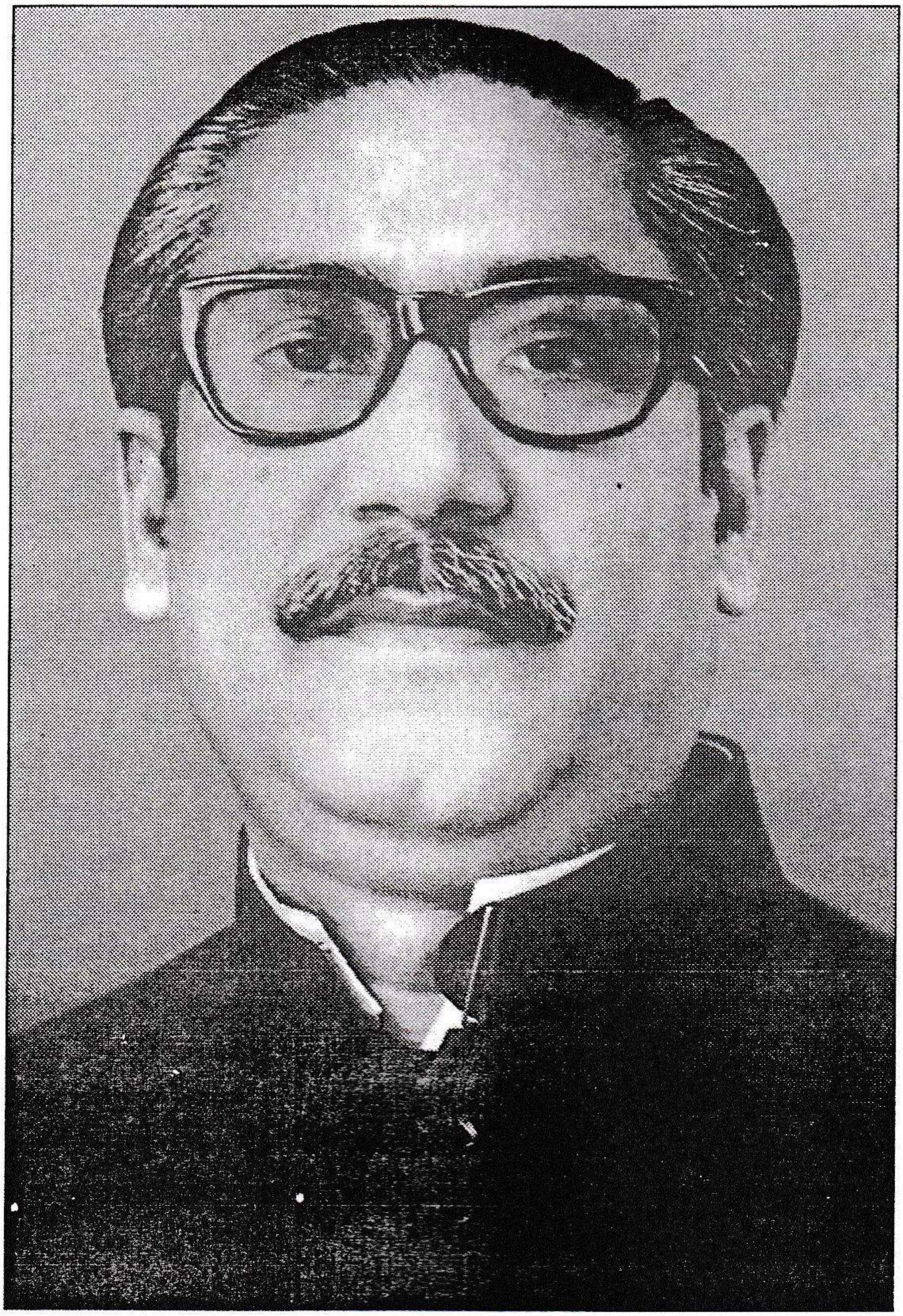

টুঙ্গিপাড়ার খোকা

দালানবাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণের টিনের বাড়ি। ওই বাড়ির উপর দিয়ে যাচ্ছিল দুই খণ্ড মেঘ। বর্ষার মেঘ। যাচ্ছিল বেশ নিচ দিয়ে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মেঘেরা।

পিছনে ততক্ষণে আরো কয়েকটা মেঘখণ্ড জড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু থেমে থাকা মেঘেদের জন্য সামনে যেতে পারছিল না। পিছন থেকে তাড়া দিল মেঘেরা, 'থেমে আছিস কেন? চল চল।'

থমকে থাকা একটা মেঘ বলল, 'এই চুপ চুপ। ওই শোন...'

মেঘেরা এবার হইচই থামিয়ে কান পাতল। আর অবাক হয়ে শুনল ওরা। 'ফাবি আইয়ে আলা ইরাব্বিকা মা তুকাজ্জিবান।'

আহা! কী সুন্দর সুর। কী সুন্দর কণ্ঠ! এমন মধুর স্বরে কে পড়ে কোরান?

বাড়ির আশপাশে তাকাল মেঘেরা। খনখনে বুড়ো একটা মেঘ বলল, 'আরে! এটা তো সেই বাড়ি!'

অন্য মেঘেরা চেঁচিয়ে ওঠল সাথে সাথে, 'কোন বাড়ি?'

'টুঙ্গিপাড়ার শেখ বাড়ি। শেখ বোরহান উদ্দিনের কথা মনে আছে? ধার্মিক এই মানুষটা বহু বছর আগে এই বংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তখন দিন ছিল শেখ বংশের।'

ছোট আর নতুন মেঘেরা কিছুই বুঝল না বুড়ো মেঘের কথা। জানতে চাইল, 'দিন ছিল মানে?'

বলতে শুরু করল বুড়ো মেঘ, 'দিন ছিল মানে, সুদিন ছিল তখন শেখদের। ওই যে দেখো—মুঘল আমলের বাড়িগুলো। ছোট ছোট ইট দিয়ে বানানো বিশাল বিশাল দালান। বাড়ির চারটা ভিটার উপর চারটা বাড়ি। বাড়ির ভিতরে ঢোকার দরজা একটা। বিরাট কাঠের একটা কপাট দিয়ে এ দরজা বন্ধ করতে হয়।'

'ওই বাড়িতে এখন কেউ থাকে না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বুড়ো মেঘ। বলল, 'একটা বাড়িতে খোকার এক দাদা থাকতেন। আরেকটা বাড়িতে থাকেন খোকার এক মামা। একটা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। দেখেছিস ভেঙে পড়া বাড়িটা? ওই যে।'

বলেই ভাঙা একটা দালান দেখাল বুড়ো মেঘ। ছোট্ট আরেকটা মেঘ বলল, 'ওই বাড়িতে কেউ থাকে না?'

ছোট্ট মেঘের কথা শুনেই খিক খিক করে হেসে উঠল সবগুলো মেঘ। মনে হলো যেন মেঘ ডাকল। হাসি থামলে বুড়ো মেঘ ধমক দিল, 'থাম তোরা! ও তো হাসির কথা বলেনি।'

তরুণ একটা মেঘ বলল, 'ভাঙা বাড়িতে বুঝি কেউ থাকে?'

বলেই আবার খিক খিক করে হাসতে লাগল তরুণ মেঘটা।

বুড়ো মেঘ এবার গর্জন করে উঠল, 'এখানে হাসির কী আছে? ভাঙা বাড়িতেও কেউ না-কেউ থাকে। কারা থাকে জানিস? সাপ থাকে। সাপ। নানা জাতের সাপ। ওটা এখন সাপের আস্তানা। বুঝেছিস?'

আবারও কোরান পড়ার শব্দ ভেসে এলো। মেঘেরা তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল। আহা! কী মধুর কণ্ঠ! কে পড়ে কোরান?

বুড়ো মেঘ বিড় বিড় করে বলল, 'ওটা খোকার গলা। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোরান পড়তে হয়। এটাই এই বংশের নিয়ম।'

হঠাৎ থেমে গেল শব্দ। খোকার কোরান পড়া শেষ। এখন?

ঘর থেকে এক ছুটে নদীর পারে এলো খোকা। নদীর পারটা খুব ভালো লাগে ওর। খোকাকে ছুটতে দেখে বুড়ো মেঘ বলল, 'ওই যে খোকা। এতক্ষণ ওর কণ্ঠই শুনছিলাম।'

খোকাকে ছুটতে দেখে এতক্ষণে টনক নড়ল মেঘেদের। বুড়ো মেঘ এবার তাড়া দিল, 'চল, চল। আমাদেরও তো ছুটতে হবে। এখন তো সবাই বর্ষার মেঘ। বর্ষার মেঘেরা কখনো এমন থেমে থাকে? শুনেছিস কোনোদিন? চল চল।'

ছোট্ট মেঘটা একটু গাঁইগুই করল, 'কিন্তু...'

দলের নেতা ওই বুড়ো মেঘ। জানতে চাইল, 'কিন্তু আবার কী!'

ছোট্ট মেঘ বলল, 'আমি খোকার গল্প আরো শুনতে চাই।'

বুড়ো মেঘ বলল, 'চলতে চলতে বলব। এবার চল।'

বলেই আর দেরি করল না মেঘের দলটা। দক্ষিণ থেকে উত্তর আকাশের দিকে চলতে লাগল। আর চলতে চলতে বুড়ো মেঘটা বলতে লাগল—শেখ বোরহানউদ্দিনের গল্প। বোরহান উদ্দিনের পূর্বপুরুষদের গল্প।

২

বুড়ো মেঘটার গলা খুব খনখনে। কথা বললেও মনে হয় ধমক দিচ্ছে। আজ বুড়োটার গলায় সেই ধার আর নেই। কণ্ঠটাও কেমন মোলায়েম। দলের বাকি মেঘেরা তো ভীষণ অবাক। কী হয়েছে আজ বুড়োর? বুড়ো মেঘের কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। বুড়ো মেঘ, তবু বর্ষায় কী গতি বুড়োটার! কিন্তু আজ হঠাৎ বুড়োটার গতি কমে গেছে। দলের মেঘেরা জানে, কোনো কারণ না থাকলে বুড়োর গতি কমে না। কারণটাও ওরা জানে।

খুক খুক খুক। আলতো করে কাশল বুড়ো মেঘ। তারপর বলতে শুরু করল—

'নিচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ—ওই আঁকাবাঁকা নদীটার নাম মধুমতি। এটা বাংলাদেশ অংশের প্রধান শাখা। আর মজার বিষয় হচ্ছে উজানে এই নদীর নাম গড়াই আর ভাটিতে মধুমতি। তো যাই হোক, এই মধুমতির তীরে এসে বাস করতে লাগলেন এক ধার্মিক মানুষ। নাম তাঁর শেখ বোরহানউদ্দিন। বোরহানউদ্দিন কোথা থেকে এবং কিভাবে মধুমতির তীরে এলেন, কেউ জানে না। অনেক দিন আগের কথা তো, কারোরই সে কথা মনে নেই। আড়াইশো বছর তো হবেই। শেখ বোরহানউদ্দিনের পরের তিন-চার পুরুষের কথা কেউ বলতে পারে না। জানা যায় বোরহানউদ্দিনের তিন-চার পরের পুরুষ শেখ কুদরতউল্লাহর কথা। কুদরতউল্লাহর ভাই শেখ একরামউল্লাহর কথাও জানা যায়। খোকারা কিন্তু এই দুই ভাইয়েরই বংশধর। এদের সময় শেখদের অর্থ-বিত্তের কমতি ছিল না। জমিদারি তো ছিলই, ব্যবসাও ছিল তাঁদের।'

কয়েকটা তরুণ মেঘ ভীষণ অবাক হলো। একটা তরুণ মেঘ বলল, 'জমিদারদের তো কখনো ব্যবসা করতে শুনিনি। শুনেছি ওরা শুধু জমির খাজনা আদায় করে আর গরিবদের উপর...'

বাকিটা আর বলতে পারল না। তার আগেই খুক খুক করে কেশে বুড়ো মেঘ বলল, 'সব জমিদার এক রকম হয় না। সব রাজা কি এক রকম?'

সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মেঘ কোরাস করে উঠল, 'উঁহু। উঁহু।'

বুড়ো মেঘ বলতে শুরু করল আবার, 'দুভাই দুরকম ছিলেন। বড় ভাই শেখ কুদরতউল্লাহ চুপচাপ ধরনের মানুষ। কারো সাতেপাঁচে থাকতেন না কখনো। ছোট ভাই আবার গ্রামের মানুষের বিচার-আচারে থাকতেন। শেখ কুদরতউল্লাহর একটা গল্প এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে।'

গল্পের কথা শুনে চনমন করে উঠল মেঘেরা। চলতে চলতে থমকে গেল সবাই। দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো মেঘের চারপাশে।

বলতে শুরু করল বুড়ো।

'তখন দেশে ছিল ইংরেজ শাসন। শাসন না বলে শোষণ বললেই মনে হয় ঠিক হয়। ইংরেজ শোষকরা যে কী করেছে, সেটা কে না জানে। খুলনা জেলার আলাইপুরে মিস্টার রাইন নামে এক ইংরেজ কুঠিয়াল ছিল। অন্য ইংরেজদের মতো এই ইংরেজটাও নীল চাষ শুরু করল আর একটা কুঠি বানাল। জমিদারির পাশাপাশি ব্যবসা করার জন্য বেশ কিছু নৌকা ছিল শেখদের। ওসব নৌকা জিনিসপত্র নিয়ে যেত কলকাতা। বেশিরভাগ ইংরেজের মতো রাইনও ছিল বদমায়েশ ধরনের। যখন তখন মালবাহী নৌকা আটক করত। আটকে রাখত অনেকদিন। শুধু শেখ নয়, যার তার নৌকা সে আটকাত। কেউ বাধা দিলেই অত্যাচার করত। ইংরেজদের অত্যাচারের কথা জানে না, এমন মানুষ নেই। এলাকায় শেখরা ছিল বেশ দাপুটে। যদিও ততদিনে দাপট আর অর্থবিত্ত কিছুটা কমতির দিকে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অন্যায়ভাবে নৌকা আটকে রাখা নিয়ে রাইনের লোকদের সঙ্গে কয়েক দফা মারামারি হয়ে গেল শেখদের। মামলা হলো কোর্টে। আর মামলায় প্রমাণও হয়ে গেল, অন্যায় রাইনই করেছে।

এবার শেখ কুদরতউল্লাহর কাছে জানতে চাইল কোর্ট, আপনার কত টাকা ক্ষতি হয়েছে, কোর্টকে বলুন। ক্ষতিপূরণের টাকা দেবে রাইন। সে দিতে বাধ্য। নইলে আদালত অবমাননার মামলাও তার বিরুদ্ধে।

তখনকার দিনে বিচারটা এমনই ছিল। ক্ষতিগ্রস্তের কাছেই জানতে চাওয়া হতো, সে কত ক্ষতিপূরণ চায়।

রাইনকে অপমান করার মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করলেন না শেখ কুদরতউল্লাহ। বললেন, ক্ষতিপূরণ চাই আধা পয়সা।

আধা পয়সা! গুঞ্জন উঠল আদালতে। কেউ আধা পয়সা জরিমানা করে?

তখন কিন্তু একশো পয়সায় এক টাকা ছিল না। চৌষট্টি পয়সায় ছিল এক টাকা। তো আধা পয়সা জরিমানার কথা শুনে অনেকেই হতাশ হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে রাইন। হম্বি-তম্বি করা রাইন একেবারে ফাটা বেলুনের মতো চুমসে গেল। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'জনাব শেখ, আপনি ক্ষতিপূরণ বাবদ যত টাকা চান দিতে রাজি আছি, আমাকে অপমান করবেন না প্লিজ। তাহলে ইংরেজ সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না; কারণ, কালা আদমি আধা পয়সা জরিমানা করেছে।'

কালা আদমির কাছে এমন হেনস্তা আর কোনো ইংরেজ হয়েছে কি না জানা নেই। কিন্তু কদু শেখ তাকে এমনভাবে অপমান করবেন, দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি রাইন।'

কয়েকটা ছোট্ট মেঘ জানতে চাইল, 'কদু শেখ!'

বুড়ো মেঘ এবার হাসতে হাসতে বলল, 'ওহ। তোদের তো বলাই হয়নি। কুদরতউল্লাহ শেখেরই প্রচলিত নাম কদু শেখ। মানুষজন তাঁকে এ নামেই ডাকত। তারপর কী হলো শোন।

অপমানে রাইনের ফর্সা চেহারা তখন কালো হয়ে গিয়েছিল। অপমানিত রাইন দয়ার আশায়—আরো বেশি জরিমানার আশায় তাকিয়ে রইল কদু শেখের দিকে। কদু শেখ বললেন, 'টাকা আমি গুনি না, মেপে রাখি। টাকার আমার দরকার নেই। তুমি আমার লোকের উপর অত্যাচার করেছ; আমি প্রতিশোধ নিলাম।'

কদু শেখের ওই গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরত। কুদরতউল্লাহ শেখের আধা পয়সা জরিমানা নিয়ে গানও বেঁধেছিলেন অনেকে। সেই গান শুনতে শুনতে এলাকার মানুষ তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলত আর ভাবত—আহ! আর কেউ না পারুক, শেখেরা দেখিয়ে দিয়েছে অন্যায়ের সাজা এভাবেও দেয়া যায়।'

৩

'কুদরতউল্লাহ শেখ আর একরামউল্লাহ শেখের মৃত্যুর দুই-এক পুরুষ পর থেকেই অর্থবিত্ত কমতে শুরু করে শেখদের। টিকে রইল কেবল তাদের আভিজাত্য। দুর্দিন শুরু হলেও ইংরেজদের সইতে পারত না শেখরা। ইংরেজকে সহজভাবে নিতে না পারার কারণে ইংরেজি পড়ল না। আর তাতে পিছিয়ে পড়ল অনেকখানি। খোকার দাদাদের আমল থেকে শেখ পরিবার ইংরেজি লেখাপড়া শুরু করল। যদিও খোকার দাদাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। খোকার নানা ছিলেন শেখ আবদুল মজিদ। দাদা শেখ আবদুল হামিদ। ছোট দাদা শেখ আবদুর রশিদ। তবে ছোট দাদাকে মানুষ চিনত 'খান সাহেব' হিসেবে। ইংরেজদের দেয়া খান সাহেব উপাধি পেয়েছিলেন তিনি। বাবাকে খোকা ডাকতেন আব্বা বলে। দাদা আর চাচা মারা যাওয়ার পর বিশাল এক পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে খোকার বাবার উপর। দুই চাচার লেখাপড়া, ফুফুদের বিয়ে দেয়া, বিশাল পরিবারের দেখাশোনা করা—সব। বাধ্য হয়ে

লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি খুঁজতে লাগলেন খোকার বাবা। সে সময় মুসলমানদের চাকরি পাওয়া ছিল খুবই কষ্টের। অনেক কষ্টে দেওয়ানি আদালতে একটা চাকরি পান। তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাতে শুরু করলেন।'

একনাগাড়ে বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠল বুড়ো মেঘ। খানিক দম নিল। তারপর বলতে শুরু করল আবার—

'খোকার জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। বড় বোন ফাতেমা, মেজ বোন আছিয়া। তারপরই খোকার জন্ম এক চৈত্র মাসে। জন্মের পর পরই খোকাকে নিয়ে হইচই পড়ে যায় বাড়িতে। কে খুশি হয়নি? ফাতেমা আর আছিয়ারও অনেক আশা ছিল, ওদের একটা ভাই হবে। হয়েছে। ভাইকে নিয়ে কী কী করবে—সেটাও যেন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে ওরা। খবর শুনে ছুটে এলেন নানা। নানার বাড়িই খোকাদের বাড়ি। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, খোকার দাদাবাড়ি আর নানাবাড়ি একেবারে পাশাপাশি। মাঝে মাত্র দুই হাত দূরত্ব। এমন মজার নানাবাড়ি-দাদাবাড়ি আর কারো আছে?

গ্রামের সবাইকে মিষ্টিমুখ করালেন নানা। আকিকার সময় 'শেখ মুজিবুর রহমান' নামটি রাখেন তাঁর নানা। আর নাম রাখার সময় তাঁর মাকে নানা বলে যান, 'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎজোড়া খ্যাতি হবে।'

বাবা তাঁকে ডাকতেন 'খোকা' বলে। চার বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তার বড় বোন ফাতেমা, মেজ বোন আছিয়া, সেজ বোন হেলেনা ও ছোট বোন লাইলী বেগম। একমাত্র ছোট ভাইয়ের নাম ছিল শেখ আবু নাসের। তখনকার দিনে বাবা-মা বড় ছেলেকে আদর করে ডাকতেন 'খোকা।' স্কুলে আর কলেজে তাঁর নাম ছিল 'মুজিব ভাই'। আর পাড়া-পড়শিরা ডাকত 'মিয়া ভাই'।'

এক ভোরে ঘুম ভেঙে গেল খোকার। আমাদের খোকা তখনও 'খোকা'। বাইরে মোরগ ডেকে উঠল। মা উঠে গেলেন ঘুম থেকে। পাশে খোকা। মায়ের কোল ঘেঁষে ঘুমায়। কিন্তু খোকার বেশ ভালো লাগে বাবার সঙ্গে ঘুমোতে। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনতে। বাবা তো এখন নেই। চাকরির জন্য গোপালগঞ্জ থাকেন। সপ্তাহ শেষে টুঙ্গিপাড়া আসেন। বাবার আসার দিনটার অপেক্ষায় থাকে খোকা। সারা সপ্তাহজুড়ে।

খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন মা। মায়ের ছোঁয়া পেয়ে ঘুম ভেঙে যায় খোকার। লাফ দিয়ে ওঠে। বলে, 'আজ না আব্বার আসার কথা?'

বাবার গ্রামে আসার দিনটি খুব প্রিয় খোকার। সারা দিন বাবার প্রতীক্ষায় কাটে। কখন বিকেল হবে—খোকার ছোট্ট মন ছটফট করে সারাক্ষণ।

সেদিন বিকেলে খেলায় মন বসাতে পারল না খোকা। এক সময় খেলা রেখে চলে গেল বাড়ির নৌকা ভেড়ার ঘাটে। উঁহু। কোনো নৌকা আসেনি। খোকা জানে, বাবা আসবেন বিকেলে। প্রতি সপ্তাহের এই দিনটিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে হিজল গাছের নিচে। এই হিজল গাছের তলাতেই নৌকাঘাট। গোপালগঞ্জ থেকে বাবা রওনা দেন দুপুরে। টুঙ্গিপাড়া আসতে আসতে সন্ধ্যে। বাবা কোন নৌকায় আসবেন? অনেক নৌকার মধ্যেই ঠিকই খুঁজে বের করে নিতে পারে ও।

ওই তো, দূর থেকে বাবাকে দেখা যাচ্ছে। বাবাকে দেখেই খোকার ছোট্ট মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে। ওকে দেখে দূর থেকে হাত নাড়লেন বাবা। খোকাও হাত নেড়ে জানান দিল, বাবাকে দেখেছে। খানিকবাদে নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ল। বাবার দুহাত ভরা জিনিসপত্র। খোকার প্রিয় কিছু খাবারও আছে। হাত ধরে বাবাকে নিয়ে বাড়িতে আসে ও। আসতে আসতে রাজ্যের প্রশ্ন করে। এটা কেন হলো? ওটা অমন নয় কেন? সেটা ওরকম হলে কী হতো।

বাবা কিন্তু একটুও রাগ করেন না। পথক্লান্তিও কাবু করতে পারে না বাবাকে। খোকার সব প্রশ্নের জবাব দেন।

বাড়িতে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে ভাত খেতে বসলেন বাবা। চট করে বাবার কোলে উঠে বসল খোকা। নিজে খাওয়ার আগে খোকার মুখে এক লোকমা ভাত তুলে দিলেন। বাবার হাতে দু-চার লোকমা ভাত খেয়ে উঠে পড়ে খোকা। বাবার গা ঘেঁষে পাশে বসে। বোনেরাও বাবার চারপাশে ঘুর ঘুর করে। আর খোকার দিকে তাকায়। আজ বড্ড শান্তি ওদের। বাবা না এলে প্রতিদিন এ সময় বোনদের সঙ্গে এটা ওটা দুষ্টুমি আর খুনসুটি লেগেই থাকত খোকার। মায়ের কাছেও যায় না ছেলেটা। সারাটা সন্ধ্যে বাবার কাছে কাছেই থাকে। রাতের খাবার শেষেও বাবার কাছছাড়া হয় না। এখনও যে বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার বাকি আছে।

রাতে বাবার গলা ধরে বিছানায় শুয়ে থাকে খোকা। আর বাবা বলতে শুরু করেন শহরের গল্প। পুরোটা শুনতেও পারে না। তার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

৪

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখে বাবা বিছানায় নেই। উঠে গেছেন সেই কখন। যখন ফজরের আজান দিয়েছিল বাড়ির পাশের মসজিদে। চট করে উঠে পড়ে খোকাও। এক ছুটে চলে আসে বাইরে। খানিকবাদে ঘরে ফেরেন বাবা। সবাইকে নিয়ে বসেন কোরান তেলাওয়াতে। কোরান তেলাওয়াত শেষ হতেই আবার বাইরে ছুটে যায় খোকা। সকালের প্রকৃতির সঙ্গে যে খোকার ভীষণ মিতালি। উঠোনের বরই গাছটায় এক ঝাঁক চড়ুই। সেই তখন থেকে কিচির-মিচির করে ডাকছে। চড়ুইগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ও। মা তখন রান্নাঘরে। এবার কচু আর লতা-পাতার জংলার মাঝ দিয়ে দৌড়ে চলে আসে সাঁকোর কাছে।

সাঁকোর ওপারে নদীর ধারে অনেক জেলে। মাছের ঝাঁকা নিয়ে নিয়ে বসে। নানা রকম মাছ—ইলিশ, শরপুঁটি, কই, মাগুর, কাতলা, রুই, চিংড়ি। সদ্য তোলা সবজির ঝাঁকা নিয়ে বসেছে সবজিওয়ালারা—পটল, বেগুন, ঝিঙে, কাঁচামরিচ, আলু। গোয়ালারাও এসেছে সদ্য দোয়ানো দুধ নিয়ে। কয়েকজন মহাজনের গলাও শুনতে পেল। এখান থেকে মাছ কিনে লঞ্চে করে গোয়ালন্দ পাঠাবে মহাজনরা। সেখান থেকে যাবে খুলনা কিংবা কলকাতা। বেশ হট্টগোল তখন নদীর পারে। কিছুক্ষণ হট্টগোল দেখে আবার ছুট দেয় খোকা। এবার এক ছুটে কলাবাগান। তারপর মধুমতি নদীর পাশ দিয়ে চলে আসে বড় দিঘির কাছে।

দিঘির পাড়ে বেশ কয়েকটা বরই গাছ। সবচেয়ে বড় বরই গাছটার দিকে তাকাল খোকা। কী সুন্দর নতুন পাতা গজিয়েছে! সবুজ সবুজ। শীতের সময় তো গাছের পাতা চোখেই পড়ে না। তখন গাছভরা কেবল বরই আর বরই। গাছভরা যখন বরই থাকে, তখন বড় আর মেজ বুজিকে নিয়ে এখানে প্রতিদিন আসত খোকা। বরই গাছটা দেখে মনে পড়ল খোকার। গাছে ঝাঁকি দিলেই ঝুর ঝুর করে পাকা বরই পড়ত নিচে। সেগুলো কুড়িয়ে লবণ দিয়ে খেতে যে কী মজা! আহা। মনে পড়তেই খোকার জিভে জল চলে এলো।

আরে! ওই তো একটা মাছরাঙা। দিঘির পাড়ে পুঁতে রাখা বাঁশের ডগার উপর এসে বসেছে একটা মাছারাঙা। চোখ বড় বড় করে মাছরাঙাটার দিকে তাকাল খোকা। এটা সেই মাছরাঙাটা না?

কয়েকদিন ধরে মাছরাঙাটাকে এখানেই বসে থাকতে দেখছে খোকা।

যখনই আসে, দ্যাখে মাছরাঙাটা ওখানে বসে তাকিয়ে আছে পানির দিকে। আজও চুপটি করে বসে আছে। তাকিয়ে আছে পানির দিকে। শরীরের উপরের দিকটা নীল আর সবুজে মেশানো। নিচে চটা রং। গলায় সাদা রঙের ছোপ। এত সুন্দর পাখি! মাছরাঙার সৌন্দর্যে মন ভরে যায় খোকার। ওদিকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় একদল সাদা বক। ধবধবে সাদা। মনে হয় যেন সাদা মেঘ। ছোট ছোট মেঘ।

হঠাৎ ঝাঁ করে পানিতে নেমে গেল মাছরাঙা। খোকার চোখ এড়ায় না। খানিক বাদে ঠোঁটে একটা মাছ নিয়ে উঠে আসে। আবার বসল গিয়ে সেই বাঁশের খুঁটিতে। মনে হয় মাছটাকে যুতসইভাবে ঠোঁটবন্দি করতে পারেনি। ঠোঁটের মধ্যেই মাছটাকে নেড়েচেড়ে ঠিক করে নিল। তারপর সাঁই করে উড়াল দিল। কোথায় গেল পাখিটা?

ইতিউতি তাকাতে লাগল খোকা। হয়তো বাসায় ফিরে গেছে। ছানাদের খাওয়াবে।

খোকার পরনে তখন হাফহাতার গেঞ্জি। নদী থেকে আসছে ভেজা ভেজা বাতাস। এই বসন্তেও খোকার গা শির শির করে। নাহ। এখানে আর নয়। আবার ছুট দেয় খোকা। এবার এক ছুটে বাড়িতে।

বাবা জানতে চাইলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে খোকা?'

ওহ্! খোকা তো ভুলেই গিয়েছিল আজ আব্বা বাড়িতে। বাবাকে বাড়িতে দেখে খোকার মনটা আরো ভালো হয়ে যায়। বাবা বললেন, 'এভাবে দিন রাত ছোটাছুটি করলে হবে? লেখাপড়াও তো করতে হবে। চলো আজ তোমাকে আমিই পড়াব।'

খুব খুশি হলো খোকা। বাবার কাছেই অ আ ক খ শিখেছে ও। এ বি সি ডিও শিখিয়েছেন বাবা। নানা রকম ছড়াও শিখিয়েছেন। একটা ছড়ার কথা তো খোকার এখনও মনে আছে—

খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে?
ধান ফুরাল পান ফুরাল
খাজনার উপায় কী
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।

ওই ছড়া শুনেই খোকার প্রশ্ন। 'আচ্ছা আব্বা—বর্গী কী? বুলবুলি কেন ধান খেল? রসুন দিয়ে কি খাজনা দেয়া যায়?'

বাবা তখন ইংরেজ শোষণের গল্প শোনান খোকাকে। 'ইংরেজরা তো বর্গীদের মতোই ছিল। বর্গী মানেই তো ডাকাত। তবে ডাকাতদের চেয়েও খারাপ ইংরেজরা। ডাকাতরা তো কেবল ডাকাতি করে চলে যায়। আর ইংরেজরা শাসনের নামে শোষণ করে। লুটপাট তো করেই আবার খাজনার জন্য অত্যাচারও চালায়। কত মানুষ ইংরেজদের অত্যাচারে নিঃশেষ হয়েছে, কে জানে!'

মনে মনে ইংরেজ শোষকদের ওপর রেগে থাকে খোকা। ভাবে, এ দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াতেই হবে।

তবে সব মিলিয়ে বাবার কাছে পড়তে খুব ভালো লাগে ওর। পড়তে বসলে নানান প্রশ্ন মাথায় গিজ গিজ করে। সবাই ওর সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। নাকি জবাব দিতে চায় না। প্রশ্নের জবাব না পেলে খুব মন খারাপ হয় ওর। কিন্তু বাবা আর সবার মতো নন। খোকার সব প্রশ্নের জবাব দেন। পড়া শেষ করে গল্পও বলেন। নীতি গল্প, মজার গল্প। কোরানের গল্প। কত্ত রকম গল্প জানেন বাবা! বাব্বাহ।

৫

খানিক আগেই মৌলবি সাহেবের কাছে পড়া শেষ করেছে খোকা। সবাই মিলে মৌলবি সাহেবের কাছে এক সাথে সুর করে কোরান পড়ে। খালাতো-ফুফাতো-চাচাতো-মামাতো ভাইবোন। সব মিলে তের-চৌদ্দজন।

কোরান পড়া শেষ হতেই সবাই হইহই করে বেরিয়ে আসে। খোকা এক দৌড়ে চলে আসে মায়ের কাছে। সূর্যটা খানিক আগেই পূর্ব আকাশে উঁকি দিয়েছে। ঝলমলে রোদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে শেখ বাড়ির উঠোনজুড়ে। ওই আলোয় চেনা ফুলের রংও যেন বদলে যায়। খোকা অবাক হয়ে দ্যাখে। চেনা গাছের পাতার রংও হয়ে যায় অন্য রকম। কী সুন্দর! কী সুন্দর!

চেনা প্রকৃতির অচেনা রূপ দেখতে দেখতে মায়ের কাছে যায় খোকা। সঙ্গে বড় দুই বুজি। মা তখন রান্নাঘরে। রান্না নিয়ে ব্যস্ত। খোকাকে দেখেই একটা জলচৌকি পেতে দেন মা। খোকার জন্য মায়ের দরদও কম নয়। খোকাকে যেন মা একটু বেশি ভালোবাসেন। খোকার ছোট আরেক ভাই

আর আরেক বোন আছে। তবু আদরের বেশিরভাগ অংশই যেন খোকার জন্য।

বড় একটা থালায় খোকাকে খেতে দেন মা। ঢেঁকিছাঁটা লাল চিড়ে ভেজানো, কোরানো নারকেল, চাঁপাকলা। সঙ্গে সরভাসা ঘন একবাটি দুধ আর খেজুরের গুড়। আরেকটা বাটিতে যেন কী আছে। চাঁপাকলা দিয়ে ভেজানো চিড়ে আর নারকেল খেতে খেতে খোকা তাকায় অন্য বাটির দিকে। মাখন!

এবার প্রতিবাদ করে খোকা, 'দুধ তো আছেই, আবার মাখন?'

মা বলেন, 'একটু মাখন তো খেতেই হবে খোকা।'

'প্রতিদিন মাখন খেতে আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো না লাগলেও খেতে হবে। কী শরীর তোমার। এমন রোগা-পাতলা আর কে আছে। জোরে বাতাস বইলে তো পড়ে যাবে।'

বলেই মিটি মিটি হাসতে লাগলেন মা। আসলেই ঠিক। খোকার শরীরটা টিংটিঙে।

'আমি মাখন খাব না।'

খোকার কথার কোনো জবাব দিলেন না মা। ততক্ষণে থালার খাবার শেষ করেছে খোকা। গুড়মাখানো দুধটুকুও খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। মা এবার মাখনের সঙ্গে খানিকটা চিনি মিশিয়ে নিজেই খাইয়ে দিলেন খোকাকে। খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, 'একটু মাখন তো খেতেই হবে। নইলে শক্তি আসবে কোত্থেকে? বর্গী তাড়াবে কেমন করে?'

সামনে থাকলে মা নিজেই খোকাকে খাইয়ে দেন। খোকাকে খাওয়াতে খুব ভালো লাগে তাঁর। তাছাড়া খেতে বসলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খায় খোকা। একে দেয়, ওকে দেয়। বকলে রা পর্যন্ত করে না। চুপ করে থাকে। মায়ের বকা শেষ হলে বলবে, 'সব আমি একাই খাব? আর কেউ বুঝি খাবে না?'

সকালের খাওয়া শেষ। এবার বই-স্লেট নিয়ে কাচারি ঘরে ছোটে খোকা। ওখানে এক মাস্টার সাহেব থাকেন। নতুন মাস্টার। এসেছেন নোয়াখালী থেকে। পণ্ডিত শাখাওয়াৎ উল্লাহ। বাংলা আর গণিত শেখান। শেখবাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে পড়ে। বর্ণমালার ছড়া পড়ে, নামতা পড়ে। সুরে সুরে। সুর করে পড়লে পড়া মনে থাকে। নামতা গেঁথে যায় মগজে।

পড়া শেষ। এবার গল্প শোনার পালা। পণ্ডিতজি অনেক রকম গল্প জানেন। দেশের গল্প, নবীজির গল্প, চার খলিফার গল্প, গৌতমবুদ্ধের গল্প। রাম-রাবণের যুদ্ধের গল্প। ওসব গল্প কেবল শুনতেই ইচ্ছে করে। কিন্তু

অনেক সময় ধরে গল্প বলেন না পণ্ডিতজি। অল্প সময়ে ছোট ছোট গল্প বলেন। যাতে সব গল্প মনে থাকে। যাতে ওসব গল্প থেকে নিজের মতো করে ভাবতে পারে সবাই—সে সুযোগটুকুও রাখেন। অনেক সময় পড়তে ইচ্ছে করে না অনেকের। কিন্তু গল্পের লোভে ঠিকই পণ্ডিতজির কাছে হাজির হয়ে যায়। শিশুদের কাছে টানার, পড়ায় মনোযোগী করার এমন অদ্ভুত গুণ তাঁর।

পড়া শেষ, গল্প শোনাও শেষ। বেলাও গড়িয়েছে অনেকখানি। এবার? ছুটি। ছুটির পর হই চই করতে করতে সবাই ছোটে বাড়িতে। বই-স্লেট ঘরে রেখেই আবার ছুট। কোমরে গামছা পেঁচিয়ে ছুট দেয় খালের দিকে। কার আগে কে খালের পানিতে ঝাঁপ দেবে—শুরু হয় প্রতিযোগিতা। স্কুল ছুটির দিন এই প্রতিযোগিতা চলে অনেক সময় ধরে। শুধু পানিতে ঝাঁপ দেয়া নয়, শাপলা তোলা, মাছধরা, সাঁতরে অনেক দূরে যাওয়া—আরো কত কী!

৬

সকাল থেকে স্কুলে যাওয়ার তাড়া থাকে সবার মধ্যে। খোকা ছাড়া। খোকা তখনও খালের পানিতে ঝাঁপাঝাপি করছে। বাড়ি থেকে খবর পাঠাতেন মা। দূত এসে খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচিয়ে যেত, 'ও মিয়া ভাই, স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। তোমার মা ডাকছেন।'

কে শোনে সে কথা। দূর সাঁতারের একটা প্রতিযোগিতা চলছে। সেটা শেষ না করে খোকা উঠবে পানি থেকে? ওদিকে স্কুলের সময় যে পেরিয়ে যায়! বাড়িতে গিয়ে আবার খেতে হবে। তারপর স্কুল। স্কুলও বেশ ভালো লাগে খোকার। অনেক মজা হয়। বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলের মাঠে ছুটোছুটি—সেটাও খুব ভালো লাগে।

ঝটপট পানি থেকে উঠে যায় খোকা। তারপর ছুট দেয় বাড়ির দিকে। বাড়িতে ফিরেই দেখে মা বসে আছেন ওর খাবার নিয়ে।

ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের ভাত। গরম গরম। ভাত থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। বড় বুজি এসে ভাতের উপর দু-চামচ ঘি ছড়িয়ে দিলেন। মা লবণ দিয়ে ভাত মাখিয়ে দিলেন। তারপর বেশ বড় একটা কইমাছ ভাজা দিলেন খোকার থালায়। ভাজা কই মাছ খোকার খুব প্রিয়। কিন্তু মাছের কাঁটা যে বাছতে জানে না।

মা একটা হাতপাখা নিয়ে এসেছেন ঘরের ভিতর থেকে। বড় বুজি হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন খোকার থালায়। আর মা বেছে দিলেন কইয়ের কাঁটা। বেশ গরম ভাত। হাতপাখার বাতাসে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। খোকা খেতে শুরু করে। আর মা তখন বলতে থাকেন, 'মন দিয়ে লেখাপড়া করবে বাবা। স্কুলে সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকবে। শিক্ষকদের সম্মান করবে।'

চটজলদি ভাত খেয়ে ওঠে খোকা। স্কুলটা খুব একটা দূরে নয়। বাড়ি থেকে মাত্র সোয়া মাইল। আবার পথে যেতে যেতে আরো কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে যেতে হবে।

বই আর খাতা নিয়ে স্কুলের পথে রওনা হয় খোকা। সাত বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয় ও। নাম গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটা প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন খোকার ছোট দাদা খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ। এলাকায় এটাই ছিল একমাত্র ইংরেজি স্কুল।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে অনেকক্ষণ ধরে বন্ধুদের নিয়ে খেলল খোকা। খেলা মানে দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি। খেলা শেষে দলবেঁধে স্কুল থেকে ফেরে খোকা। পাটগাতি বাজারের পিছনে নদীর ধারে একটা বড়সড় জারুল গাছ। ওই জারুল তলায় এসে নদীতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে খোকা। এভাবে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে দারুণ লাগে। বিশেষ করে চৈত্র মাসের গরমে। নদীর ঠাণ্ডা পানিতে শরীরটা যেন পুরো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাছাড়া জায়গাটাও ছায়াঢাকা। ঘাটে বেশ কয়েকটা নৌকা বাঁধা। একটা নৌকার দিকে নজর আটকে গেল খোকার। ওর সমান বয়েসী এক শিশু। কুচকুচে কালো শরীর। কিন্তু পেটানো শরীর। নৌকায় বসে ভাত খাচ্ছে। কী মজা!

জানতে চাইল খোকা, 'এই, তোমার তো অনেক মজা। নৌকায় বসেই মজা করে খাচ্ছ!'

নৌকায় বসা ছেলেটি জবাব দিল, 'নৌকাই আমার বাড়ি। এখানে বসে খাব না তো, কোথায় খাব?'

ঠিক কথা। আবার জানতে চাইল খোকা, 'কী খাচ্ছ?'

'কী আবার, ভাত!'

'কী দিয়ে খাচ্ছ?'

মানুষ নিয়ে খোকার কৌতূহল সবসময়ই। কোন মানুষ কেমন, কোন মানুষের জীবনযাপন কেমন—এসব তার জানা চাই। এই কৌতূহলটা ওর ভিতর থেকেই।

মনে হয় ছেলেটি খোকার কথা শুনতে পায়নি। খাওয়ার দিকেই ওর যত মনোযোগ। নিশ্চয়ই খুব মজার তরকারি দিয়ে ভাত খাচ্ছে!

আবার জানতে চাইল খোকা, 'কী দিয়ে ভাত খাচ্ছ?'

এবার মনে হলো বেশ অনিচ্ছায় জবাব দিল ছেলেটি, 'পেঁয়াজ দিয়ে।'

পেঁয়াজ দিয়ে! বেশ অবাক হলো খোকা। শুধু পেঁয়াজ আর লবণ দিয়ে কেউ এত মজা করে ভাত খেতে পারে! নিশ্চয়ই অনেক মজা। নইলে খাচ্ছে কেন?

জানতে চাইল খোকা, 'খুব মজা, তাই না?'

গপ গপ করে ভাত খাচ্ছিল ছেলেটি। এবার আর জবাব দিল না। ভাত খাওয়া শেষে ঢক ঢক করে পানি খেল। মনে হলো পানি দিয়েই পেটের খালি জায়গাটা ভরে নিল।

নাহ্! ছেলেটিকে দেখে মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে গেল খোকার। স্কুলে আসার আগে বড় একটা কই মাছ দিয়ে ঘিমাখা ভাত খেয়ে এসেছে ও। অথচ ওর বয়সী একটা ছেলে শুধু পিঁয়াজ দিয়ে ভাত খেল! সবাই একই রকম খেতে পায় না কেন?

ভাবতে গিয়ে মন আরো খারাপ হয়ে যায় খোকার। ওদিকে বন্ধুরা তখন ভূতের গল্প ফেঁদে বসেছে। একজন গল্প বলছে বাকিরা মন দিয়ে শুনছে। কিন্তু খোকার সেদিকে মন নেই। খোকা যেন ওদের মধ্যে থেকেও নেই। ও তখন তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। দুপুর শেষের রোদ পড়ে নদীর পানি তখন ঝিকঝিক করছে। কাছে দূরে অনেক অনেক নৌকা। ছোট নৌকা, বড় নৌকা। নৌকায় আবার নানার রঙের পাল। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ। কোথায় যায় এত নৌকা? কোথায়? অজানা এক ঘোরের মধ্যে চলে যায় খোকা।

হঠাৎ বাঁশির শব্দে ঘোর ভাঙে খোকার। কী মিষ্টি বাঁশির সুর। কে বাজায় এত সুন্দর করে? আশেপাশে তাকায় খোকা। আরে! সেই ছেলেটাই তো। একটু আগেই যে পিঁয়াজ দিয়ে ভাত খেয়েছিল পরম তৃপ্তি নিয়ে। ওর বাজানো বাঁশিতে এত সুন্দর সুর! আহা! মনটা ভরে গেল খোকার। বন্ধুরা তখনও গল্প-গুজব করছিল। খোকা ওদের থামিয়ে দিল। সবাইকে কান পেতে বাঁশির সুর শোনার ইশারা করে। সবাই গল্প থামিয়ে কান পাতে। শান্ত নদীর পারে বসে বাঁশির সুর শোনায় যে কী আনন্দ—সবাই এবার টের পায়। হাজার গল্প থেকেও মজার। কিসের পাখির শিস, কিসের বাতাসে নাচুনে পাতার শব্দ! সবকিছুর চেয়ে সুন্দর ওই বাঁশির সুর। কিন্তু এমন সুন্দর বাঁশি বাজানোর শক্তি ছেলেটা পেল কোথা থেকে? কেউ কি ওকে শিখিয়েছে?

ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে দমাতে পারল না খোকা। হঠাৎ থেমে যায় বাঁশির সুর।

ছেলেটা কিন্তু ইচ্ছে করে বাঁশি বাজানো থামায়নি। নৌকার পাটাতনের নিচে বেশ পানি জমে গিয়েছে। ওই পানি সেচতে হবে। একটা নারকেলের মালা নিয়ে পানি সেচতে শুরু করে ছেলেটি। দলবল নিয়ে খোকা চলে যায় ছেলেটির নৌকার কাছে।

জানতে চাইল খোকা, 'কী নাম তোমার?'

পানি সেচতে সেচতেই জবাব দেয় ছেলেটি, 'গৌতম।'

গৌতম! চমকে ওঠে খোকা। মনে পড়ে যায় ইতিহাসের গল্প। পণ্ডিতজি বলেছিলেন গৌতমের গল্প। গৌতম মানে গৌতমবুদ্ধ। প্রথমে ছিলেন রাজা। পরে রাজ্যপাট ত্যাগ করে হয়ে যান সন্ন্যাসী।

আবার জানতে চাইল খোকা, 'বাড়ি কোথায় তোমার?'

'ওই যে ওই গাঁয়ে।'

আঙুল দিয়ে দূরের একটা গ্রাম দেখায় গৌতম।

জানতে চায় খোকা, 'গ্রামের নাম কী?'

'চিংগাড়ি।'

'বাঁশি বাজানো শিখেছ কার কাছে?'

'কারো কাছে না। নিজে নিজে।'

নিজে নিজে! অবাক হয় খোকা। নিজে নিজে এত সুন্দর বাঁশি বাজানো শিখল কেমন করে? তার মানে কেউ যেটা ইচ্ছে করে, সেটা সে শিখতে পারে। ইচ্ছেশক্তি থাকলেই হলো।

এবার নিজে থেকেই কথা বলতে লাগল গৌতম, 'বাঁশিটা ছিল বাবার। এখন আর বাবা বাজায় না। আমিই বাজাই।'

হঠাৎ খোকার হাত ধরে টান দেয় একজন, 'মিয়া ভাই, অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাড়িতে চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে তো!'

আরে তাই তো! খোকার যেন সম্বিত ফেরে। মা তো চিন্তা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল খোকা।

পাটাতনের সবটুকু পানি সেচে নিয়েছে গৌতম। পানি সেচা শেষ করেই আবার বাঁশিটা বের করে। তারপর আবার সুর তোলে।

ততক্ষণে অনেক দূরে চলে আসে খোকা। আবারও হঠাৎ বাঁশির সুর কানে আসে ওর। আর পিছন ফিরে তাকায়। ওই দূরে নদীর উপর নৌকা। অনেকগুলো নৌকা ঘাটে বাঁধা। কিন্তু কোন নৌকা থেকে যে বাঁশির সুরটা

ভেসে আসছে—সেটা ঠাওর করতে পারে না। সূর্যের আলো চোখে ধাঁধা লাগিয়েছে খোকার। কিন্তু সুরটা ঠিকই কানে এসে বাজছে। বাড়ির পথে চলতে চলতে একসময় সে সুর মিলিয়ে যায়।

৭

পণ্ডিতজির কাছে পড়া শেষ করে ঘরে ঢুকল খোকা। বই আর স্লেট রেখেই উঠানে এসে দাঁড়াল। ওদিকে রান্নাঘর থেকে মা ডাক দিলেন, 'খোকা, অ্যাই খোকা, নাস্তাটা খেয়ে যাও।'

'আজ তো স্কুল নেই। একটু পরে খাব।'

'সে কী রে! স্কুল নেই বলে পরে খেতে হবে কেন? এমনিতেই তালপাতার সেপাই, বাঁশের মতো শরীর—তারপর যদি খাওয়ায় অনিয়ম করো, চলবে? শিগগির খেতে এসো।'

আজ আসলে খোকার খাওয়ায় মন নেই। মন বলছে কখন দলবল নিয়ে পাখির বাসা খুঁজে বের করবে। পাখির বাসা খুঁজে বের করতে খুব ভালো লাগে ওর। তারপর যে গাছে বাসা, সে গাছে উঠে পাখির বাসাটা দেখবে। দেখবে কয়টা ডিম আছে বাসায়। দেখবে কয়টা ডিম ফুটে ছানা বেরিয়েছে। তারপর সে ছানারা যেদিন প্রথম উড়তে শিখবে—নিজেও হাততালি দেবে। যেন ছানাদের উৎসাহ দিচ্ছে। আজ একটু দস্যিপনা না করলেই নয়। ওদিকে বড় আর মেজ বুজি বলে রেখেছেন, গাছ থেকে জাম্বুরা পেড়ে দিতে হবে। খোকার মতো এমন তরতরিয়ে গাছে উঠতে আর কে পারে।

কিন্তু মা যে কেমন? ওকে খাওয়ানো ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। ধ্যাৎ! ভাল্লাগে না।

আবারও মায়ের গলা, 'কোথায় তুমি খোকা? খেতে এসো শিগগির।'

নাহ। মায়ের সঙ্গে পারা গেল না। রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের সামনে আসন পেতে বসল। বলল, 'তুমি খাইয়ে দাও।'

বড় বুজি মাকে সাহায্য করছিলেন। বললেন, 'আমাকে জাম্বুরা পেড়ে দিবি না খোকা?'

'দেব।'

চটজলদি খেয়েই উঠে পড়ল খোকা। হাঁ হাঁ করে উঠলেন মা। 'করছ কী খোকা? খাবারটা শেষ হোক।'

'আর খাব না আম্মা। পেট ভরে গেছে।'

কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলে মা বললেন, 'কই। পুরো খাবার তো শেষ হয়নি। পুরোটা শেষ করো।'

'আর খেতে পারব না। বললাম না পেট ভরে গেছে।'

'তাহলে এই মাখনটুকু...'

পুরো কথা শেষ করতে পারলেন না মা। তার আগেই খোকা রান্নাঘর থেকে হাওয়া।

বাইরে বেরোতেই মেজ বুজি ধরে ফেললেন খোকাকে। জানতে চাইলেন মেজ বুজি, 'কোথায় যাচ্ছিস খোকা?'

'আজ বাবুই পাখির বাসাটা দেখব। কয়টা ছানা ফুটেছে দেখতে হবে না?'

মেজ বুজি বললেন, 'পরে যা। আগে আমাদের জাম্বুরা পেড়ে দে।'

বলেই খোকাকে ধরে নিয়ে গেলেন বাড়ির পিছনে। বিশাল এক জাম্বুরা গাছ ওখানে। জাম্বুরা বাত্তি হয়ে গেছে। এখন খেতে দারুণ মজা হবে।

তর তর করে গাছে উঠে পড়ল খোকা। তারপর এ ডাল ও ডাল বেয়ে বেশ কয়েকটা বাত্তি জাম্বুরা পেড়ে দিল মেজ বুজিকে। যেমন তরতরিয়ে উঠেছিল, তেমনি তরতরিয়ে গাছ থেকে নেমে বলল, 'এবার হয়েছে?'

মেজ বুজি আর কী বলবেন। তাঁর মুখভরা তখন জাম্বুরা। ততক্ষণে জাম্বুরার খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন লবণ-মরিচ দিয়ে।

এবার! আজ তো স্কুল বন্ধ। খালে গিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি পরে করলেও চলবে। খোকা ছুটল মাঠের পারে। ওখানে বেশ কয়েকটা তালগাছ আর খেজুর গাছ। একটা গাছে তো অনেকগুলো বাবুই পাখির বাসা। সবগুলো বাসায় বাবুইরা থাকে না। কোন বাসায় থাকে আর কোন বাসায় থাকে না, খোকার চেয়ে ভালো আর কে জানে? কোন বাসায় ডিম আছে আর কোন বাসায় ডিম ফুটে ছানা বেরিয়েছে, সেটাও খোকার অজানা নয়। গতকালই একটা বাসায় উঁকি মেরেছিল খোকা। তিনটে ডিম ছিল বাসায়। ডিম ফুটে ছানা বেরোবে বেরোবে করছে। একবার উঁকি দিয়ে দেখা যাক।

তালগাছে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু খোকার কাছে অসাধ্য নয় কিছু। সাবধানে পা টিপে টিপে তালগাছে উঠে পড়ল খোকা। হাতের নাগালে এলো বাবুইর বাসাটা। খোকাকে দেখেই বাসার ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল একটা বাবুই পাখি। এবার বাসায় উঁকি দিয়ে দেখল, নাহ। এখনও ডিম ফুটে ছানা বেরোয়নি। সাবধানে গাছ থেকে নেমে পড়ল।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই সবাই খালে গিয়ে দাপাদাপি করছে। এবার এক ছুটে খাল পারে। তারপর ঝপাৎ। পানিতে লাফিয়ে পড়ল খোকা।

তবে বেশিক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করতে মন চাইল না। বাড়িতে মনটা পড়ে রইল। ভুলু আর বানরের খোঁজ নিতে হবে। আবার এক ছুটে বাড়িতে। হুঁ। যা ভেবেছিল তাই। ওই তো গোয়ালঘরের চালে বানরটা বসে আছে। বানরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল খোকা—'আয় আয়।'

কিন্তু এ কী! বানরের আগেই ভুলুটা এসে হাজির। ভুলু জানে কখন খোকার কাছে আসতে হয়। ভুলুর মাথায় হাত বোলাতে না বোলাতেই চলে এলো বানর। বসল খোকার পাশে। ততক্ষণে খোকার হাতে এক ছড়া কলা দিয়ে গেছে মেজ বুজি। একটা একটা করে খোসা ছাড়িয়ে বানরকে কলা খাওয়াতে লাগল খোকা।

বানরকে খোকা কলা খাওয়াচ্ছে দেখে কুকুরটা এবার কুঁই কুঁই শব্দে লাফাতে লাগল। এটা দেখে খিক খিক করে হেসে উঠল খোকা। বলল, 'কি রে ভুলু, তুইও কলা খাবি?'

বলেই একটা কলার খোসা ছাড়িয়ে ভুলুর মুখের সামনে ধরল খোকা। কলাটা শুঁকল ভুলু। কিন্তু মুখ লাগাল না। আবারও খিক খিক করে হেসে ওঠল খোকা।

বড় বুজি কখন যে খোকার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন, খোকা টেরই পায়নি। বড় বুজি বললেন, 'খাঁচার ময়নাটার দিকেও একটু নজর দিস খোকা। ওটাকে আর কতদিন ওভাবে আটকে রাখবি?'

তখনই মনে পড়ল খোকার। ময়নাছানাটাকে পেয়েছিল বিলের পারের জঙ্গলে। নিচে পড়েছিল। নিশ্চয়ই গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। তখনো উড়তে শেখেনি বলে নিজের বাসায়ও যেতে পারেনি। কী আর করা। ছানাটাকে নিয়ে চলে এলো। শুনেছে ময়নাকে নাকি কথা বলা শেখানো যায়। খোকা এখন থেকেই সে চেষ্টা করছে। ময়নাছানাটাকে কথা বলা শেখাচ্ছে। ছোট্ট ছানাটা। দেখতে মোটেই সুন্দর নয়। এখনও ঠিক মতো পালক গজায়নি। তাতে কি। ছোট্ট ছানাটাকে আলতো করে ধরে মুখের সামনে এনে ঠোঁটে একটা চুমু দেয় খোকা। তারপর ছড়া শোনায়। যদি পাখিটা কথা বলতে শেখে!

হঠাৎ হাঁক দিল খোকা, 'হেলেন!'

ছোট বোন হেলেন দৌড়ে এলো। জানতে চাইল, 'জ্বি মিয়াভাই?'

'ময়নাছানাকে আজ খাবার দিয়েছিস?'

ওহ হো। মনেই ছিল না হেলেনের। আসলে মিয়াভাই যেদিন বাড়িতে থাকে, সেদিন সবকিছু ভুলে যায় হেলেন—খোকার ছোট বোনটি। মিয়াভাই যেভাবে ছুটোছুটি করে, দলবল নিয়ে খেলে—সবকিছু তো ভুলে যাবেই।

খোকা বুঝল ময়নাছানাকে খাবার দেয়া হয়নি। বলল, 'যা তো কয়েকটা ভাঙা চাল নিয়ে আয়।'

এক দৌড়ে ভাঙা চাল নিয়ে এলো হেলেন। কিন্তু ময়নাছানা ভাঙা চাল মুখেই নিল না। কী করা যায়?

এবার খোকা বলল, 'দেখ তো মায়ের ভাত রান্না হয়েছে কি না? কয়েকটা ভাত নিয়ে আয়।'

আবার দৌড়ে গেল হেলেন। কয়েকটা গরম ভাত নিয়ে এলো একটা ছোট মাটির পাত্রে। নাহ। ভাতও ঠোঁটে নিল না ময়নাছানা। এখন উপায়? ময়নাছানা তো কিছুই খাচ্ছে না। ছানার ঠোঁট দুটো হাত দিয়ে আলতো করে ধরে ফাঁকা করল খোকা। তারপর কয়েকটা ভাত ঢুকিয়ে দিল গলার ভিতর। সঙ্গে সঙ্গে একটু পানিও ঢেলে দিল গলায়।

মনটা খারাপ হয়ে গেল খোকার। পাখিছানাকে খাওয়ানো তো বেশ কষ্ট। আবারও ওভাবে কয়েকটা ভাত খাওয়াল ছানাটাকে। তারপর বলল, 'বুঝেছি আমার ময়না পাখি। তোমার জন্য কয়েকটা কেঁচো ধরে আনব। কেঁচো পেলে নিশ্চয়ই খুশি হবে তুমি। নাকি উইপোকা খাবে? উইপোকাও ধরে আনব।'

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল হেলেন। বলল, 'উইপোকা কোথায় পাবে মিয়াভাই?'

মুখটা গম্ভীর করে জবাব দিল খোকা, 'আমি জানি উইয়ের ঢিবি কোথায় আছে। তোকেও দেখিয়ে দেব। মাঝে মাঝে ওখান থেকে উঁই এনে ময়নাছানাকে খাওয়াবি। যদি ঠিকমতো যত্ন-আত্তি করিস, তবে ময়নাটা তোর।'

'সত্যি!'

'সত্যি।'

খুশিতে লাফ দিয়ে ওঠে হেলেন। দৌড়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে বলতে থাকে, 'জানো আম্মা, মিয়াভাই আমাকে ময়না পাখিটা দিয়ে দিয়েছেন।'

৮

বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাস দুটোয় বেশ গরম পড়েছিল। আকাশে এক ফোঁটা মেঘের দেখা নেই। মেঘগুলো কোথায় গেল কে জানে?

আকাশের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে খোকা ভাবে, মেঘেদের মনে হয় গুহা আছে। ওই গুহাই মেঘেদের ঘর। গরমের এই সময়টায় মেঘেরা ঘরেই থাকে। বাইরে বেরোয় না। ঘর থেকে মানুষ বেরুনোরই উপায় নেই, আবার মেঘ!

কিন্তু আমাদের সেই মেঘের দলটা বেরিয়েছে। তখন সকাল। দলবল নিয়ে খালের পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছে খোকা। আজ বাবা বাড়িতে। বেশিক্ষণ পানিতে থাকার উপায় নেই। চটজলদি পানি থেকে উঠে পড়ল খোকা।

এত তাড়াতাড়ি খোকাকে পানি থেকে উঠতে দেখে অবাক হলো মেঘের দলটি। দলের সবচেয়ে ছোট মেঘ বলল, 'আহ্! কী মজা পানিতে ডুব দিতে। এই গরমে এর চেয়ে মজার আর কিছু আছে? যদি একটা ডুব দিয়ে আসতে পারতাম!'

বুড়ো মেঘ বলল, 'আমারও তো তেমন ইচ্ছে। কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশি নিচে নামা যায় না।'

ছোট্ট মেঘটা বলল, 'কিন্তু খোকা আজ এত তাড়াতাড়ি পানি থেকে উঠে গেল কেন?'

একটা তরুণ মেঘ বলল, 'মনে হয় শালিকছানাদের দেখতে যাচ্ছে।'

'এখানে আবার শালিক এলো কোত্থেকে? খোকা তো একটা ময়নাছানা এনে পুষছে।'

বুড়ো মেঘ বলল, 'একটা শালিকছানা পোষার খুব শখ খোকার। সেজন্যই শালিকের বাসায় হানা দিচ্ছে গত তিনদিন ধরে।'

তরুণ মেঘ জানতে চাইল, 'শালিকের বাসাটা কোথায়?'

বুড়ো মেঘ বলল, 'কোথায় আবার, ওই যে আম গাছটায়।'

ছোট্ট মেঘ বলল, 'আম গাছের ডালে?'

বুড়ো মেঘ বলল, 'উঁহু। শালিকরা ডালে বাসা বানায় না। বানায় গাছের কোটরে।'

'কিন্তু শালিকছানা পুষবে কেন খোকা?'

বুড়ো মেঘ খক খক করে কাশল আগে। তারপর বলল, 'কথা বলা শেখানোর জন্য।'

এবার অবাক হয়ে গেল সবগুলো মেঘ। কথা বলা শেখানোর জন্য!

কয়েকটা তরুণ মেঘ তো খিক খিক করে হেসেই ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'শালিকরা আবার কথা বলা শিখল কবে থেকে?'

সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল বুড়ো মেঘ। কপাল কুঁচকে বলল, 'যেটা জানিস না, সেটা নিয়ে হাসাহাসি করছিস? শোন, শালিক পাখিও কথা বলতে জানে। তবে শেখাতে হয়।'

সূর্যটা আরো তেতে উঠেছে। মধ্যদুপুর প্রায়। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরছে।

তাড়া দিল বুড়ো মেঘ, 'চল চল। তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকতে হবে। নইলে...'

নইলে কী হবে জানে না মেঘেরা। বুড়ো মেঘ কোনো দিন সেটা বলেনি।

আর খোকা?

আজ ওর ভীষণ মজা। স্কুল নেই। আম-কাঁঠালের ছুটি। বাবাও বাড়িতে। আহা!

রাতে বাবার গলা ধরে শুয়ে থাকতে ওর খুব ভালো লাগে। এত বড় হয়েছে, তবু বাবার আদর পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে গরমের ছুটি ফুরিয়ে যায়। ততদিনে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। বর্ষাকালটা খুব ভালো লাগে খোকার। আকাশ থেকে মেঘগুলো কেমন নিচে নেমে আসে। মনে হয় যেন মেঘেরা মিতালি করতে চায় মাটির সঙ্গে। তাই তো এত বৃষ্টি ঝরায়। গরমে মাঠ-ঘাট শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। বর্ষা এসে সব ভিজিয়ে দেয়। নতুন পানি পেয়ে নতুন করে যেন জেগে ওঠে গাছেরা। মাটির তলা থেকেও মাথা বের করে নতুন নতুন চারা। তাছাড়া আরেকটা মজা আছে। স্কুলে যাওয়ার মজা। বর্ষাকালে হেঁটে স্কুলে যেতে হয় না। কী মজা, কী মজা!

খোকাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল আছে। খালটা সরু হলে কী হবে! ভীষণ তেজ তার। মধুমতি আর বাইগার নদী যেখানে মিলেছে, খালটাও সেখানে গিয়ে নদীর সঙ্গে মিশেছে। তেজ তো তার হবেই। নদীর সঙ্গে যোগাযোগ বলে কথা! এই খালের পারেই শেখবাড়ির কাচারিঘর।

তো বর্ষাকালে স্কুলে যেতে আসতে ভীষণ মজা হয় খোকাদের। মজাটা

হলো নৌকায় করে স্কুলে যেতে হয়। খোকা তখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বাড়ির বড় ছেলে। দলবল নিয়ে স্কুলে যায়। আবার স্কুল থেকেও দলবল নিয়ে ফেরে। ফেরার পথে কোনো কোনো দিন এদিক ওদিকও ঘুরে আসে। হেঁটে তো আর ঘুরতে হয় না, যত ঘোরাঘুরি নৌকায়। দলের সবাই বেশ মজাও পায়। স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলো কেন? এমন প্রশ্নের একটা জবাব দিলেই সাতখুন মাফ—মিয়াভাই ঘুরতে নিয়ে গেছে।

কিন্তু একদিন সব উল্টে-পাল্টে গেল। সেদিনও এমনি এক বর্ষার দিন। চারদিকে পানি থই থই। থেমে থেমে বৃষ্টি ঝরছে কয়েকদিন ধরে।

মা বললেন, 'এই বৃষ্টিতে স্কুলে যাবে খোকা?'

'যাব।'

স্কুলে তো একটা মজা আছেই, আবার স্কুলে যেতে আসতে নতুন করে যে মজা—সেটা হারাতে চায় না খোকা। কোনোভাবেই না।

মা কিন্তু খোকাকে কোনো ভালো কাজে কখনো বাধা দেন না। তবে খারাপ কিছু দেখলে সাবধান করে দেন। এবারও সাবধান করে দিলেন মা, 'তবে বাবা একটু সাবধানে যেও। চারদিকে যেভাবে পানি বাড়ছে। আমার ভয়ই হয়।'

মাকে আশ্বস্ত করে খোকা, 'ভয়ের কিছু নেই আম্মা। আমি তো আর একা যাচ্ছি না। শেখবাড়ির অনেকেই আমার সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছে। তাছাড়া আমি কি আর আগের মতো ছোট আছি? বড় হয়েছি না?'

হুঁ। মা খোকার দিকে তাকান। সত্যি খোকা একটু বড় হয়েছে।

সকাল থেকেই আকাশ অন্ধকার। ঝির ঝির বৃষ্টি তো হচ্ছেই। মেঘও ডাকছে—গুড় গুড়, গুড় গুড়।

এর মধ্যেই স্কুলে গেল খোকা। কেউ ছাতা নিয়ে, কেউ মাথাল দিয়ে মাথা ঢেকে। স্কুল ছুটির পর সবাই আবার একসঙ্গে নৌকায় উঠল। আজ আর অন্য কোথাও যাবে না। আজ সোজা বাড়িতে। মা পই পই করে বলে দিয়েছেন। তাছাড়া চারদিক যেরকম অন্ধকার! দিক হারানোও বিচিত্র কিছু না।

একদল স্কুল-ফেরত যাত্রী নিয়ে ভালোয় ভালোয় খাল পর্যন্ত এলো নৌকা। তারপর হঠাৎ যে কী হলো, নৌকা গেল উল্টে।

হুড়মুড় করে সবাই পড়ে গেল খালের পানিতে। বই-খাতা ভিজে একাকার। বর্ষার খাল। এখন কী আর সরু আছে! চওড়ায় হয়ে গেছে তিনগুণ বড়। আর কী ঢেউ খালে! ওরে বাপরে! কোনো রকমে সাঁতরে

খালের পারে এলো সবাই। কিন্তু নৌকাটা হঠাৎ উল্টে গেল কেন?

ধ্যাৎ! এসব ভাবার সময় কোথায়। ওদিকে আবার আকাশ ভেঙে আসছে। বজ্রপাত হচ্ছে সমানে। যে কোনো সময় মুষলধারায় বৃষ্টি নামতে পারে। ভেজা শরীর নিয়ে দৌড়ে সবাই ছুটল যে যার বাড়ির দিকে।

খোকার জন্য বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল মায়ের। মনটা কেন যেন খুব ছটফট করছিল। খোকার কিছু হয়নি তো!

কোনো কাজে মন বসাতে পারছেন না। খানিক আগেই হাত থেকে একটা ঢাকনা পড়ে গিয়েছে। উফ্! কী যে হলো আজ।

একটু পরেই দৌড়ে ঘরে ঢুকল খোকা। খোকাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন মা। আর ধরেই আঁৎকে উঠলেন, 'এ কী খোকা! তোমার সারা শরীর এমন ভেজা কেন? বৃষ্টিতে ভিজেছ?'

ডানে-বামে মাথা নেড়ে জানাল খোকা—'না।'

'তবে?'

পিছন থেকে কে যেন বলল, 'আজ আমাদের নৌকা উল্টে গিয়েছিল। মিয়াভাই পানিতে পড়ে গিয়েছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে জানাল খোকা, 'ইস্! মনে হয় যেন আমি একাই পড়ে গিয়েছিলাম। পড়ে তো গিয়েছিলাম আমরা সবাই। ভাগ্যিস কারো কিছু হয়নি। যে স্রোত খালে!'

আঁ! আবারও আঁৎকে ওঠেন মা। কী যেন ভাবতে থাকেন খানিকক্ষণ। তারপর খোকার গায়ের ভেজা কাপড় খুলে দিতে শুরু করলেন। তাঁর নয়নের মণি খোকা। খোকার কিছু হয়ে গেলে যে তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তারচেয়ে কাজ নেই স্কুলে গিয়ে। জানিয়ে দিলেন মা, 'শোনো খোকা, কাল থেকে আর তোমার স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।'

জীবনে কখনো মায়ের কথার অবাধ্য হয়নি খোকা। মা যখন যা করতে বলেছেন, করেছে। তাই বলে মায়ের আদেশে স্কুলে যাওয়াটাও বন্ধ!

স্কুলে যে অনেক মজা! শিক্ষকদের পড়ানো, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা—সব কিছু চোখের সামনে ভাসতে লাগল খোকার। তবু মায়ের আদেশ। মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আদেশ মেনে নিল খোকা। আমাদের টুঙ্গিপাড়ার খোকা।

৯

সুইট-ই... সিট

সিই-হ ইউ...টিট...টিট

সিস...সুই-ই...ই...ই

সুইট-ই...সিট

ডাকটা শুনে চমকে উঠল খোকা। ডাকটা কোথা থেকে আসছে?

উপরে তাকাল খোকা। হুঁ। ওই তো একটা দোয়েল পাখি। বসে আছে সোনালু গাছের ডালে। কী সুন্দর মিষ্টি ডাক! দোয়েলের শিস দারুণ লাগে খোকার। কতদিন ঘুম থেকে জেগেছে দোয়েলের শিস শুনে।

এই গাছে কি দোয়েলের বাসা আছে? গাছের এ-ডাল ও-ডালে চোখ বোলাল খোকা। চোখে পড়ছে না। কিন্তু দোয়েলটা তো ওই ডাল থেকে নড়ছেই না। তবে নিশ্চয়ই আশপাশে বাসা আছে। এবার তীক্ষ্ণ নজর বোলাল পুরো গাছটায়। নাহ। তবু চোখে পড়ছে না। হঠাৎ আরেকটা ডাক কানে এলো খোকার—ছিঁহিহি...হিহি...সিই-ই...হি...হি...।

আরে! এটা তো দোয়েল ছানার ডাক। কোথায় ছানা?

এবার আরো মনোযোগ দিয়ে খুঁজতে থাকে খোকা।

স্কুল নেই বলে খানিকটা মন খারাপ ছিল খোকার। স্কুলে কত মজা। স্কুল যেহেতু নেই, ঘরে বসে থেকে কী করবে? বেরিয়েছে পাখি দেখতে। পাখির ডাক শুনতে।

কত্ত রকম পাখি! কত্ত রকম ডাক!

হঠাৎ একদল পুঁচকে এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, 'মিয়া ভাই, মিয়া ভাই ওদিকে চলো। একটা মজার জিনিস দেখাব।'

মজার জিনিস! পুঁচকেদের দল নিয়ে ছুটল খোকা। কী এমন মজার জিনিস, দেখতেই হয়।

পুঁচকেদের দলটা মিয়া ভাইকে টানতে টানতে নিয়ে এলো মাঠের পারে। একটা হিজল গাছের তলায়। হিজল গাছের ওপাশে আবার বিশাল এক দিঘি। এবার মাঠের দিকে আঙুল তুলে দেখাল এক পুঁচকে। বলল, 'মিয়া ভাই দ্যাখো। আজব পাখি...'

অবাক হয়ে মাঠে তাকাল খোকা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। এত পাখি মাঠে! কী করছে ওরা?

সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা মুচকি হাসি ফুটে উঠল খোকার। হাসতে হাসতে বলল, 'আরে! ওগুলো তো বাবুই পাখি।'

বাবুই পাখি! অবাক হলো পুঁচকের দল। কিন্তু বাবুই পাখির মাথা তো হলুদ থাকে।

বুঝিয়ে বলল খোকা, 'বাসা বানানোর সময় বাবুই পাখির মাথা হলুদ থাকে। অন্য সময় থাকে না।'

এবার পুঁচকের দলটা অবাক হয়ে মিয়া ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত কিছু জানে মিয়া ভাই?

আরেকটা পুঁচকে জানতে চাইল, 'ধান খেতে ওরা কী করছে মিয়া ভাই?'

'কচি ধান জোগাড় করছে।'

কচি ধান!

পুঁচকেদের চোখ উঠে গেল কপালে। জানতে চাইল, 'কচি ধান দিয়ে ওরা কী করবে?'

খোকা বলল, 'বাসায় নিয়ে যাবে।'

নাহ্! মিয়া ভাই বেশ রহস্য করে কথা বলছে।

'আহা, খোলাসা করে বলো না মিয়া ভাই। কচি ধান বাসায় নিয়ে কী করবে ওরা?'

এবার হাসতে হাসতে খোকা বলল, 'ধানের শাস বের করবে।'

এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল খুদেদের দল। 'কিন্তু কেন?'

গম্ভীর গলায় এবার খোকা জবাব দিল, 'ছানাদের খাওয়াবে। ভালো মতো তাকিয়ে দ্যাখ, বাবুই পাখির বেশিরভাগ বাসা ভারী ভারী লাগছে। লাগছে ভারী ভারী?'

'বাসা ভারী কি হালকা কেমন করে বুঝব মিয়া ভাই?'

হাসতে হাসতে খোকা বলল, 'তোদের মাথায় বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই দেখছি। তোদের বুঝিয়ে বলছি। ভালোমতো তাকিয়ে দ্যাখ তো, বাতাসে বাবুই পাখির বাসাগুলো দুলছে। দুলছে?'

'হুঁ। দুলছে তো।'

'কিন্তু দ্যাখ, সবগুলো বাসা একরকম করে দুলছে? কিছু বাসা বেশি দুলছে। কিছু বাসা অল্প দুলছে। কেন, জানিস?'

মাথা নাড়ল পুঁচকেদের দল। ওদের মাথায় এত বুদ্ধি নেই।

এবার বুঝিয়ে বলল খোকা, 'যেগুলো বেশি দুলছে ওই বাসাগুলো খালি। খালি বাসা বেশি দোলে। আর যে বাসাগুলো কম দুলছে ওগুলোতে

ছানা আর পাখি আছে। হয় বাবা-পাখি, নয়তো মা-পাখি। বাসা পাহারায় একটা পাখি থাকবেই। বলা তো যায় না, কখন কে ছানা চুরি করে নিয়ে যায়!'

অবাক হয়ে পুঁচকেদের দলটা এবার তাকিয়ে থাকে বাবুই পাখির বাসাগুলোর দিকে। বাতাসে বাসাগুলো দোল খাচ্ছে। দোদুল দুল, দোদুল দুল...

আকাশের দিকে তাকিয়ে খোকা বলল, 'চল, তালাব থেকে শাপলা তুলে নিয়ে আসি।'

হইহই করে উঠল দলটা। মিয়া ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে অনেক মজা। একছুটে দলটা চলে এলো শাপলা তালাবে। তালাবের নাম কিন্তু শাপলা তালাব নয়, তবে ওই তালাবে (পুকুর) ভরপুর শাপলা ফুটে থাকে। এ তালাবে মাঝে মাঝেই শাপলা তোলার প্রতিযোগিতা চলে খোকা আর ওর বন্ধুদের মধ্যে।

তালাবের পাড়ে একটা বাঁকানো নারকেল গাছ। গাছটা বেশ সুন্দর করে বাঁকিয়ে তালাবের উপর কাত হয়ে আছে। এই সময় তালাবের পানি কেমন উঁচু হয়ে আছে। বাঁকানো নারকেল গাছ থেকে মাত্র দু-তিন ফুট নিচেই পানি। তালাবের পাড় থেকে গাছ বেয়ে নয়, হেঁটে হেঁটেই গাছের মাথায় যাওয়া যায়। একেবারে গাছের মাথার কাছে এলেই পাড় থেকে তালাবের অনেকখানি গভীরে চলে আসা যায়। নারকেল গাছের মাথার কাছ থেকে পানিতে ঝাঁপ দিতে কী যে আনন্দ! আহা। তবে একা একা এখানে আসতে বেশ ভয় পায় পুঁচকেদের দল। কী জানি কেন! এই তালাবে কেউ স্নানও করে না। কী স্বচ্ছ আর টলটলে পানি।

ঝপাৎ!

ঝপাৎ!

ঝপাৎ!

নারকেল গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পানিতে নেমে গেল পুঁচকেদের দলটা। খোকা ঝাঁপ দিল সবার শেষে।

ঝপাৎ!

শাপলা তালাবে ঝাঁপাঝাঁপি করতে করতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে যায়, টের পায় না কেউ। নারকেল গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে তালাবের পানিতে পড়ে সাঁতার কেটে পাড়ে আসে। আবার হেঁটে হেঁটে গাছের মাথায় এসে ঝাঁপ।

আবারও ঝপাৎ, ঝপাৎ, ঝপাৎ, ঝপাং।

ঠিক তখুনি সেই মেঘদলটা যাচ্ছিল সেই তালাবের উপর দিয়ে। তখন ওরা শরতের মেঘ। সাদা মেঘ। তুলোর মতো। সাদা মেঘের দলটা হঠাৎ থেমে যায় তালাবের উপর এসে। বুড়ো মেঘ, জোয়ান মেঘ, তরুণ মেঘ, কিশোর মেঘ, ছোট মেঘ, পুঁচকে মেঘ। মেঘের পুরো দলটা তাকিয়ে থাকে নিচে। তাকিয়ে থাকে তালাবের পানির দিকে। তাকিয়ে থাকে তালাবের শাপলা ফুলের দিকে। লাল লাল শাপলা। তাকিয়ে থাকে একদল দুরন্ত শিশু-কিশোরের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মেঘদলটারও খুব ইচ্ছে হয় তালাবের পানিতে ঝাঁপ দিতে। কিন্তু তখন তো ওরা আকাশের বেশ উঁচুতে। নিচে নামবে কেমন করে? জানে না ওরা। তাই ওরা তাকিয়ে থাকে কেবল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। হঠাৎ এক দমকা বাতাস এসে ওদের ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায় আকাশের পূর্ব দিকে। মন খারাপ করে মেঘের দলটা সেদিকেই চলে যায়।

১০

রাতেই বাবা জানালেন, 'খোকা, কাল তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

খুশিতে আটখানা হয়ে গেল খোকা। হাসিটা এ-কান থেকে ও-কান অব্দি ছড়িয়ে গেল। জানতে চাইল, 'কোথায় যাব আব্বা?'

'গোপালগঞ্জ।'

'গোপালগঞ্জ!'

আরো খুশি হলো খোকা। উফ। একে তো স্কুল বন্ধ। তারওপর টুঙ্গিপাড়ার পথ-ঘাট, বন-বাদাড়, পুকুর-খাল—সব ঘুরে চরে বেড়ানো শেষ। বাবুইয়ের বাসা, কাঠবিড়ালির খোড়ল, দোয়েলের শিস, মাছরাঙার মাছ শিকার—সবকিছু দেখেছে। দেখেছে মেঘগুলো কেমন করে কাছে আসে, দূরে যায়। কোন ঋতুতে নিচে নামে, কোন ঋতুতে আকাশের আরো উপরে উঠে যায়—অবলোকন করেছে। এবার নতুন একটা জায়গা থেকে কদিনের জন্য বেড়িয়ে এলে মন্দ হয় না।

খুশিতে ছুটতে ছুটতে মায়ের কাছে গেল খোকা। রাতের রান্না করছিলেন মা তখন। রান্নাঘরের চুলার আগুনের আলোয় মায়ের মুখটাও কেমন সোনারঙের হয়ে উঠেছে।

মাকে বলল খোকা, 'আম্মা, কাল আমি গোপালগঞ্জ যাব। আব্বার সঙ্গে।'

মা জানতে চাইলেন, 'কে বলেছে?'

'আব্বাই বলেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখটা মলিন হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না মায়ের। খোকা এবার জানতে চাইল, 'আপনি খুশি হননি আম্মা?'

বাঁশের কাঠি দিয়ে চুলার উপর থাকা রান্নার হাঁড়িটা নাড়তে লাগলেন মা। কোনো কথা বললেন না।

আবারও জানতে চাইল খোকা, 'আম্মা আপনি খুশি হননি?'

তবু মায়ের মুখে রা নেই। খোকা এবার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, 'আম্মা, আপনার কি মন খারাপ?'

খোকার দিকে তাকালেন মা। খোকা দেখল মায়ের দুচোখ বেয়ে পানি পড়ছে। মা কি কাঁদছেন? কোনো কারণে কি মায়ের মন খারাপ?

জানতে চাইল খোকা, 'আম্মা আপনি কাঁদছেন কেন?'

ভাঙা কণ্ঠে মা বললেন, 'কই কাঁদছি? কাঁদছি না তো!'

'তাহলে আপনার চোখে পানি কেন?'

'এমনি। চোখে ধোঁয়া গেছে। তুমি এখন ঘরে যাও খোকা। তোমার চোখেও ধোঁয়া যাবে। তখন তোমার চোখ দিয়েও পানি ঝরবে। যাও যাও, ঘরে যাও। আব্বার কাছে পড়তে বসো। অনেকদিন লেখাপড়া হয় না তোমার। লেখাপড়া না করলে বড় হবে কেমন করে?'

বাবা বাড়িতে থাকলে রাতের খাবারটা খুব আয়োজন করেই হয়। কত রকম পদ রান্না করেন মা। নিজের হাতে বাবা আর খোকাকে পাতে তুলে দেন মা। আজও খোকা আর বাবার পাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু চুপচাপ। অন্যদিন এতটা চুপচাপ থাকেন না। নানান কথা বলেন। এই তো গত সপ্তাহেই, খোকার পাতে খাবার বেড়ে দিচ্ছিলেন। খোকা বলছিল, 'আর কত দিচ্ছেন আম্মা। এত খেতে পারব না তো!'

মা বলেছিলেন, 'শরীরটা কী করে রেখেছ খেয়াল আছে? তোমার বয়েসী আর কোন ছেলেটা এমন পাটকাঠির মতো, দেখাতে পারবে? এত কম খেলে শরীর ঠিক থাকবে কী করে? এত কম কেউ খায়?'

খোকা বলেছিল, 'খায় আম্মা। ওই পাটগাতি বাজারের পাশে মধুমতির পাড়ে নৌকার মাঝি। আমার বয়েসী। একদিন দেখলাম শুধু পিঁয়াজ আর মরিচ দিয়ে পান্তা ভাত খাচ্ছে। তা-ও দুপুর বেলা। দুপুরে কেউ পান্তাভাত খায়?'

মা বলেছিলেন, 'খোকা, খাওয়ার সময় মন দিয়ে খেতে হয়। যা দিচ্ছি, খেয়ে নাও।'

কিন্তু আজ? আজ মা পাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু মনটা পড়ে আছে অন্য কিছুতে। মায়ের কি কিছু হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে মায়ের? কিংবা কোনো কারণে মন খারাপ? জানে না খোকা। বাবাও খুব চুপটি করে খেয়ে যাচ্ছেন। বাবার পাতে মা যা দিচ্ছেন, বাবা কোনো গাঁইগুই করছেন না। অন্য সময় হলে প্রবল আপত্তি করতেন। তবে কি বাবারও কিছু হয়েছে?

রহস্যটা ফাঁস হলো আরো পরে।

বাবার গলা ধরে শুয়ে ছিল খোকা। বাবা বাড়ি থাকলে বাবার গলা ধরে না শুলে খোকার ঘুম আসে না। নানা ধরনের গল্প করেন বাবা। কিন্তু বাবার আজ গল্প বলার মেজাজ নেই। তবু খোকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবার কাছে জানতে চাইল, 'আচ্ছা আব্বা, গোপালগঞ্জ কি খুব বড় শহর?'

'হুঁ।'

'ইটের দালান আছে?'

'হুঁ।'

'অনেক?'

'হুঁ।'

'রাস্তা আছে?'

'রাস্তা কেন থাকবে না। গ্রাম-শহর সবখানেই রাস্তা থাকে।'

'রাস্তা দেখতে কেমন?'

'রাস্তার মতো।'

'না মানে রাস্তা দেখতে কি আমাদের টুঙ্গিপাড়ার রাস্তার মতো?'

'না।'

'অন্য রকম?'

'হুঁ।'

হঠাৎ আর কোনো শব্দ নেই খোকার। বাবা বুঝলেন খোকা ঘুমিয়েছে। আলতো করে গা থেকে খোকার হাত আর পা সরিয়ে দিলেন বাবা। চুপি চুপি উঠে পড়লেন বিছানা থেকে। খবরটা শোনার পর থেকে খোকার মায়ের মন খারাপ। কান্নাকাটিও করেছেন। রাতের খাবার খেয়েছে কি না কে জানে।

ঘরের দাওয়ায় বসে ছিলেন মা। বাবা গিয়ে পাশে বসলেন। মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। জানতে চাইলেন, 'খেয়েছ?'

মা জবাব দিলেন না। বাবা বুঝলেন, মা রেগে আছেন।

বাবা আবার জানতে চাইলেন, 'তোমার কি মন খারাপ?'

তবু মা কোনো কথা বললেন না।

বাবা বললেন, 'বুঝতে পারছি তুমি মন খারাপ করে আছো। কিন্তু...'

নাহ। মা কোনো কথাই বলছেন না। বাবা আবার বলতে শুরু করেন, 'শুনেছ নিশ্চয়ই, কাল খোকাকে আমার সঙ্গে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাচ্ছি। ওখানেই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব।'

মা এবার হু হু করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'খোকাকে ছাড়া আমি কিভাবে থাকব? কদিন আগে কেবল জ্বর থেকে উঠল। এখনও শরীর দুর্বল। এই সময় আপনি ওকে নিয়ে যাবেন?'

বাবা বোঝাতে চাইলেন মাকে, 'এখানে ওর পড়াশোনা হচ্ছে না। সারা দিন কেবল টইটই করে ঘুরে বেড়ায়। নিজের স্বাধীন মতো চলে।'

মা এত কিছু শুনতে রাজি নন। তিনি কেবলই বলে যাচ্ছেন, 'ওকে ছাড়া আমি থাকব কেমন করে? কে ওকে খাওয়াবে? এখনও তো নিজের হাতে ঠিক মতো খেতে পারে না। এখন ওর আরো বেশি যত্ন দরকার। দিন দিন শরীরটা কেমন লিকলিকে হয়ে যাচ্ছে।'

বাবা বললেন, 'এসব ভাবলে তো হবে না খোকার মা। খোকাকে ছেড়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। ও এখন বড় হচ্ছে। দিন দিন আরো বড় হবে। ওকে আরো বড় হতে হবে। তুমি দেখে নিও, আমাদের খোকা অনেক বড় হবে। জন্মের পর ওর নানা বলেছিল না, খোকার জড়ৎজোড়া নাম হবে। কথাটা একদিন ঠিক ঠিক সত্যি হবে।'

কিন্তু মায়ের সেই একই কথা, 'আমি খোকাকে ছাড়া থাকতে পারব না।'

বলেই হু হু করে কেঁদে উঠলেন মা।

বাবা কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। কখন যে বড় বুজি উঠে এসেছেন, টের পাননি বাবা-মা। এতক্ষণ বাবা আর মায়ের অনেক কথাই শুনেছেন। খোকা এখানে থাকবে না, জানার পর বড় বুজিরও মনটা খারাপ হয়ে গেছে। চোখ ভিজে এসেছে। আঁচলে চোখ মুছে মা-বাবার সামনে এলেন বড় বুজি।

মাকে বোঝাতে চাইলেন, 'এমন করবেন না আম্মা। মন শক্ত করেন। এখন খোকা ছোট বলে কাছে রেখে দিতে চাইছেন। যখন বড় হবে, লেখাপড়া করতে অনেক দূরে যাবে, তখন কী করবেন?'

বাবা বললেন, 'তাছাড়া একেবারে তো অনেক দিনের জন্য যাচ্ছে না খোকা। প্রতি সপ্তাহে আমার সঙ্গে বাড়িতে আসবে। আর স্কুলে ছুটিছাটা হলে এখানে এসেই থাকবে। শহরও তো কাছে।'

কাঁদতে কাঁদতে মা বললেন, 'তবু আমি খোকাকে ছাড়ব না। খোকা আমার কাছেই থাকবে।'

বাবা বললেন, 'তুমি যদি এমন করো, তাহলে খোকা কখনো বড় হবে?'

ধরা গলায় বললেন মা, 'বললাম তো খোকাকে ছাড়া আমি একদিনও থাকতে পারব না।'

বাবা বললেন, 'তাহলে এক কাজ করো। তোমরাও নইলে চলো আমার সাথে। সবাই একসাথে শহরে থাকবে।'

মা বললেন, 'সেটা হয় নাকি? সেটা তো সম্ভব নয়।'

বাবা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'সম্ভব নয় কেন?'

মা বোঝালেন, 'ঘরবাড়ি খালি রেখে কিভাবে যাব? আমি চলে গেলে ঘরে সন্ধ্যাবাতি দেবে কে? ফকির এলে ভিক্ষা দেবে কে? ঘর থেকে খালি হাতে ফকির চলে যাবে, এটা হতে পারে না। আমি বাড়ি ছেড়ে যাব না।'

বাবাও বোঝাতে শুরু করলেন, 'খোকার মা, শোনো। তুমি যদি জেদ ধরে থাকো তাহলেও তো হবে না। তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ তোমাকেই ভাবতে হবে। এখন থেকেই ভাবতে হবে। এখানে পড়ে থাকলে ও দুনিয়াটা চিনবে কেমন করে? মানুষকে জানবে কেমন করে?'

মা আর কিছু বললেন না। চুপ করে বাবার কথা শুনলেন। বাবার কথা বলা শেষে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বাবা বুঝলেন, মা ভাবছেন। বাবাও চুপ করে মাকে ভাবার সময় দিলেন। অনেকক্ষণ পর বাবা বললেন, 'কাল সকাল সকাল যাব। খোকার কাপড়-চোপড় গোছগাছ করে দিও।'

সে রাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। তুমুল বৃষ্টি।

আবার বিছানায় এসে শুলেন বাবা। খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, খোকার ঠাণ্ডা লাগছে কি না। গায়ে হাত দিতেই কথা বলে উঠল খোকা, 'বেড়াতে নয়, স্কুলে ভর্তি হতেই আমি গোপালগঞ্জ যাচ্ছি, তাই না আব্বা? কিন্তু আমার যে আম্মার কাছে থাকতে ভালো লাগে।'

কী বলবেন বুঝতে পারলেন না বাবা। মনে মনে বলার মতো কিছু একটা কথা খুঁজতে থাকলেন। ওদিকে টিনের চালে রিমঝিম সুরে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। একই সুর, একই তাল। বৃষ্টির সেই সুর শুনতে শুনতে কখন যে খোকা আর বাবা ঘুমিয়ে গেলেন, টের পেলেন না কেউ।

১১

দিনটা অন্যরকম।

উঁহু। দিনটা মোটেই অন্যরকম নয়। বাকি দিনগুলোর মতোই। খোকার ঘুম ভাঙল পাখির কিচির মিচির শব্দে। বিশেষ করে চড়ুইগুলো। এত ঝগড়া করতে পারে ওরা! বাপরে বাপ।

আর গোয়ালঘরের ছাদের উপর লাফঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে বানরটা। আর ডাকাডাকি করছে।

ভুলুটা তো সেই ভোর থেকে বারদুয়ারে। কুঁই কুঁই করে ডেকে যাচ্ছে।

ওদিকে খাঁচায় রাখা ময়নাছানাটা ততদিনে বেশ বড় হয়ে গেছে। উড়তে পারবে? কে জানে। ওটা অবশ্য চুপচাপ। মনে হচ্ছে ভালো ছাত্র হতে পারবে না ওটা। খোকা তো আর কম কিছু শেখায়নি ওটাকে। কিন্তু ওটার যে একটা নাম দেয়ার দরকার ছিল! ইস্! বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

পাশে তাকাল খোকা। বাবা নেই। সেই সকালে উঠে গেছেন। ওর গায়ে কাঁথা। নিশ্চয়ই রাতে ঠাণ্ডায় কুঁচকে গিয়েছিল ও। গায়ে কাঁথা দিয়েছেন বাবা। কাঁথা সরিয়ে উঠে বসল খোকা। পাশের ঘরে গিয়ে দেখে নাসের ঘুমোচ্ছে। ছোট্ট নাসের। ওর ছোট ভাইটি। নাসেরের পাশে শুয়ে আছে হেলেন। ছোট্ট বোনটি।

বারান্দায় এসে দাঁড়ায় খোকা। সকালের আকাশটা মুখ গোমড়া করে রেখেছে। আকাশভরা মেঘ। রোদ নেই একরত্তি। বরই গাছে চড়ুইদের কোলাহল।

ইস। এসময় বাইরে থেকে একচক্কর ঘুরে এলে মন্দ হতো না। কিন্তু কিভাবে যাবে? উঠানে বন্যার পানি। বাঁশ বসিয়ে রান্নাঘর আর টয়লেটে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরের বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে থাকে খোকা। খোকা জেনে গিয়েছে টুঙ্গিপাড়ায় আজ ওর শেষ সকাল। এরপর ও আসবে বেড়াতে। নিজের বাড়িতে বেড়াতে আসা! বাহ্! দারুণ তো! বেশ পুলক অনুভব করে খোকা।

কিন্তু...

কী যেন ভাবতে থাকে খোকা। গোয়াল ঘরের চালের দিকে তাকাল। নাহ্! বানরটাকে দেখা যাচ্ছে না। একটু আগেও তো হাঁকডাক শুনেছিল। কোথায় গেল এখন?

ওই তো ভুলু। এতক্ষণ কুঁই কুঁই করছিল। ওকে দেখেই থেমে গেছে।

সারা সকাল ঘরে বসেই কাটিয়ে দিয়েছে খোকা। নাসের, হেলেনদের সঙ্গে গল্প করেছে। কিন্তু সময় যে কাটছে না। এর মধ্যেই খোকা জেনে গেছে আজ নয়, কাল গোপালগঞ্জ যাচ্ছে ও। শুনে কেন যেন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ওর। কেন খারাপ হলো জানে না ও। মুখ ভার করে রইল।

'আকাশের মুখ ভার বলে কি খোকার মুখটাও ভার নাকি?'

জানতে চাইল ছোট্ট মেঘটা। মেঘদলটার তখন ফুরসৎ নেই একটুও। এদিক ছোটো, ওদিকে ছোটো। যেদিকে বাতাস সেদিকেই ছুটতে হচ্ছে ওদের। তা-ও আবার ঝাঁক বেঁধে। গায়ে গা লাগিয়ে। বর্ষার মেঘের মতো।

সত্যিই তো! মেঘেরাও তো মুখ ভার করে ছুটছিল। আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। পূর্ব থেকে পশ্চিম। উত্তর থেকে দক্ষিণ। অদেখা বাতাসের নির্দেশ মেনে ছুটতে হচ্ছে—এ নিয়ে খুব দুঃখ মেঘেদের। কিন্তু খোকার দুঃখটা কোথায়? খোকার মুখটা ভার কেন?

জবাব না পেয়ে আবারও জানতে চাইল ছোট্ট মেঘটা, 'আকাশের মুখ ভার বলে কি খোকার মুখটাও ভার?'

বুড়ো মেঘটার মেজাজ তখন তিরিক্ষি। একটুতেই রেগে ওঠে। প্রথমবার তো কথাই বলল না। কিন্তু ছোট্ট মেঘগুলো বড্ড একগুঁয়ে। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করতেই থাকে।

ওদিকে চারপাশ থেকে নানান মেঘেরা দলে দলে ঘিরে রেখেছে ওদের। চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে। মেঘগুলোর কিছুই করার নেই। বাতাসও নেই এক ফোঁটা। বাতাস না থাকলে ওরা নড়তেও পারে না। খানিক আগেও বাতাস ছিল। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এমন হয়। হঠাৎ হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। বাতাসগুলো তখন কোথায় যায় কে জানে।

জবাব না পেয়ে এবার ছোট্ট মেঘটারও মুখ ভার হয়ে যায়। এতক্ষণ পুরো মেঘদলের মধ্যে ওই ছোট্ট মেঘটাই ছিল সাদা। এখন হয়ে গেল পুরো কালো। ওকে আর এখন চেনাই যাচ্ছে না। কালো মেঘেদের ভিড়ে হারিয়ে গেছে একেবারেই।

বুড়ো মেঘটার খুব মায়া হলো। ছোট্ট মেঘটাকে একটা খোঁচা মেরে বলল, 'হ্যাঁ রে, তুই দেখছি কালো হয়ে গেছিস। রাগ করেছিস?'

জবাব দিল না ছোট্ট মেঘ। বুড়ো মেঘ বলল, 'বুঝেছি। আমি তোর কথার জবাব দেইনি বলে আমার কথারও জবাব দিচ্ছিস না। আচ্ছা। বেশ। তবে তো শোধবাদ হয়ে গেল। এবার বলছি শোন। ওই যে খোকা, এতটা বছর

টুঙ্গিপাড়ার চেনা পরিবেশে বড় হয়েছে। এত বন্ধুদের সঙ্গে মিশেছে। শেখ বাড়ির ছেলেপুলেদের সঙ্গে দাবড়ে বেড়িয়েছে। নিজের ইচ্ছেমতো স্বাধীন হয়ে ঘুরেছে। এখন ও চলে যাচ্ছে চেনা জগৎ ছেড়ে। ওর তো মন খারাপ হবেই। নাকি! এই তোকে যদি এখন অন্য একটা মেঘদলের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেই, তোর কেমন লাগবে বল তো?'

জবাব দিল ছোট্ট মেঘ, 'মোটেই ভালো লাগবে না। অচেনা মেঘের ভিড়ে তো আমার দমই আটকে আসবে।'

বুড়ো মেঘ বলল, 'খোকারও হয়েছে সেটাই।'

ছোট্ট মেঘ বলল, 'তাহলে ও না গেলেই পারে!'

বুড়ো মেঘ বলল, 'কেন যাবে না শুনি! ও তো মানুষ। তোর আর আমার মতো মেঘ তো নয়। ওকে তো যেতেই হবে। মানুষই তো নতুন কিছু দেখে শেখে। যত বেশি নতুন মানুষের সঙ্গে মিশবে, তত বেশি শিখতে পারবে। আর যে মানুষটা শিখবে না, সে পিছিয়ে পড়বে।'

ছোট্ট মেঘটা কী বুঝল কে জানে। সেই পুরনো প্রশ্নটা আবার করল, 'আকাশের মুখটা ভার বলে কি খোকার মুখটাও ভার নাকি?'

নাহ্! বড্ড হতাশ হলো বুড়ো মেঘ। এতক্ষণ কী বলল আর ছোট্ট মেঘটা কী বুঝল। আবার প্রথম থেকে বোঝাতে হবে তাহলে। বেশ রাগ হলো বুড়ো মেঘটার। হালকা একটা গর্জন করল। তারপর গর গর করে বলল, 'হুম। কথাটা একেবারে খারাপ বলিসনি। আকাশের কালো চেহারা দেখলে অনেক মানুষেরই অনেক সময় মুখ ভার হয়ে যায়।'

এবার মাথা ঝাঁকিয়ে ছোট্ট মেঘ বলল, 'ও আচ্ছা। বুঝেছি।'

রাগে গরগর করতে করতে বুড়ো মেঘ বলল, 'কচু বুঝেছিস।'

১২

দুপুরের খাবার-দাবার শেষ হয়েছে খানিক আগে। সবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর খোকার কাপড়-চোপড় গোছাতে শুরু করেন মা। ওটা দেখে আরো খারাপ লাগে খোকার। চোখ দুটো ভিজে আসে।

বাবা খেয়াল করেন সেটা। জানতে চাইলেন, 'তুমি কি কষ্ট পাচ্ছ খোকা?'

'হুঁ।'

'কেন?'

কিছু একটা বলতে চেয়েও বলতে পারে না। কথাটা গলার কাছে এসে আটকে যায়।

মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে খোকা, একটু পর পর শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছেন মা।

মাকে কাঁদতে দেখে এবার বেঁকে বসে খোকা, 'আব্বা আমি যাব না।'

বাবা বললেন, 'তা তো হয় না খোকা। তুমি আমার কাছে থেকে লেখাপড়া করবে।'

'আর আম্মা! আম্মা যাবেন না আমাদের সঙ্গে?'

'না।'

'আমি আম্মার কাছেই থাকব।'

এবার গম্ভীর কণ্ঠে বাবা বললেন, 'এ নিয়ে আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি আমার সঙ্গেই যাচ্ছ।'

তখনই হঠাৎ কী যে হলো খোকার, মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি আপনাকে রেখে কোথাও যাব না আম্মা। আপনাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন মা। ধরা গলায় বললেন, 'না খোকা। তোমাকে যেতেই হবে। তোমার আব্বা ঠিক কাজটাই করছেন। আব্বার কথা শুনতে হয়। তোমার আব্বা যা করছেন তোমার ভালোর জন্যই করছেন। তোমাকে তো অনেক বড় হতে হবে। অনেক বড়। যেদিন অনেক বড় হবে, সেদিন আর এই কষ্টটাকে কষ্ট মনে হবে না।'

মায়ের কান্না কান্না কণ্ঠে খোকার মন আরো খারাপ হয়ে যায়। কত কষ্ট বুকে চেপে তবেই মা ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আর খোকা? খোকা ভাবতে লাগল, ওর কী শুধু মায়ের জন্যই কষ্ট হবে? আর কারো জন্য না?

উঁহু। আর কারো জন্য কষ্ট হবে না। এই টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। বাড়ির অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গাছপালা, ওই বরই গাছটা, ভুলু, নাকবোঁচা বানরটা, দুপুরে দাপাদাপি করা ওই খাল, ওই বাইগার নদী—কারো জন্য কি কষ্ট হবে না? একটু মন খারাপও হবে না? খোকা যতই বিড় বিড় করে বলতে চায়, হবে না, হবে না, হবে না।

কিন্তু কেন যেন বুকের বাঁ-পাশটা মোচড় দিয়ে ওঠে। খালি খালি লাগে। মনটা হঠাৎ বলে ওঠে, কষ্ট! কষ্ট! বাঁধনছেঁড়া কষ্ট। শিকড় থেকে উপড়ে নেয়া গাছের মতো কষ্ট।

টুঙ্গিপাড়ার বাতাস, টুঙ্গিপাড়ার আকাশ, টুঙ্গিপাড়ার মানুষ—সবার জন্য কষ্ট হতে লাগল। এই টুঙ্গিপাড়াই তো ওর জননী, জন্মভূমি। টুঙ্গিপাড়া ছেড়ে ও থাকবে কেমন করে?

পরদিন। বড় উঠোন পর্যন্ত এগিয়ে এলেন মা, ছোট ফুফু, মেজ বুজি। মায়ের কোলে নাসের। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে খোকার দিকে। মাত্র এক বছর বয়স। নাসেরের দিকে এগিয়ে যায় খোকা। মাথায় হাত বুলিয়ে চুমু খায় টোবলা টোবলা গালে। আর মা?

মা ততক্ষণে জড়িয়ে ধরেছেন খোকাকে। বুকের সঙ্গে। কোলে যে নাসের আছে, সেটা খেয়াল নেই মায়ের। সবটুকু আদর যেন খোকার জন্য। নিংড়ে নিংড়ে বের করে দিচ্ছেন হৃদয় থেকে। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছেন খোকার কপাল।

আগে থেকেই বজরা ঠিক করে রেখেছিলেন বাবা। সকাল সকাল বজরা এসে হাজির। বজরা আসতেই তোড়জোড় পড়ে গিয়েছিল খোকাদের ঘরে। বাবা তাড়া দিতে লাগলেন, 'অ্যাই খোকা তুমি তৈরি তো! বজরা চলে এসেছে কিন্তু। কাপড়-চোপড় গোছানো আছে তো?'

খোকার হয়ে জবাব দিলেন মা, 'খোকার কাপড় তো গতকালই গুছিয়ে দিয়েছি।'

বাবার তাড়া কমে না, 'তাহলে দেরি হচ্ছে কেন?'

মা বললেন, 'পথে কী খাবেন কে জানে? পথের খাবারটা গুছিয়ে দিচ্ছি।'

ততক্ষণে খোকার কাপড়-চোপড়, বাবার দরকারি ব্যাগ—চলে গেছে বজরায়। রান্না করা খাবারও টিফিন ক্যারিয়ারে গুছিয়ে দিয়েছেন মা। সেটাও চলে যাচ্ছে বজরায়। আর দেরি করা যায় না। বাবা আগে আগে, আর পিছনে খোকা। খোকার সঙ্গে সবাই।

হঠাৎ মাথায় ভেজা ভেজা কী যেন লাগল। মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল খোকা। নাহ। মা আর কান্না আটকে রাখতে পারলেন না। খোকার চোখ দুটো ভিজে আসতে লাগল। মেজ বুজি এগিয়ে এলো। খোকার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। পাশের বাড়ির চাচা-চাচিও এসেছেন খোকাকে বিদায় জানাতে। বন্যার পানিতে পথ-ঘাট তলিয়ে গেছে। বন্যার পানি মাড়িয়ে সবাই চলল খোকার সঙ্গে। একেবারে ঘাট পর্যন্ত। ওই তো ঘাটে বজরা। খোকার জন্য অপেক্ষা করছে। বজরায় উঠেও তাড়া দিচ্ছেন বাবা, 'শিগগির এসো খোকা। দেরি হয়ে যাচ্ছে তো!'

এমন করলে তো সারা দিনও বিদায় নেয়া শেষ হবে না। খোকা বুঝতে

পেরেছে। চোখ দুটোও যে আর বাঁধ মানছে না। সোজা বজরায় গিয়ে উঠে পড়ল খোকা। একবারের জন্যও আর পিছনে ফিরে তাকাল না।

কী হবে পিছনে তাকিয়ে? প্রিয় টুঙ্গিপাড়া ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট আরো বাড়বে। ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে বজরা। মাঝি বৈঠা বাইতে শুরু করেছে। ছলাৎ ছলাৎ ছলাৎ। তর তর করে এগিয়ে চলেছে।

বজরার ভিতরে শুয়ে আছেন বাবা। ভিতরটা কী সুন্দর!

সূর্যটা তখন ঠিক মাথার উপর। চোখ ধাঁধানো রোদ। কিন্তু ভালো লাগছে দেখতে। খোকা এ-পাশে ও-পাশে দেখতে লাগল। সূর্যের আলোয় গাছের পাতাগুলো কেমন চকচক করছে। বৃষ্টির পর এমন সূর্যের আলোয় চারপাশটা খুব ঝকঝকে তকতকে দেখায়। দেখাবেই তো! বৃষ্টির পানিতে গাছের পাতা থেকে সব ময়লা যে ধুয়ে মুছে সাফ। নদীর পানিও কেমন ঝিকমিক করছে। এর আগে প্রকৃতির এমন সুন্দর রূপ কী খোকার চোখে পড়েছিল? হয়তো পড়েছিল। কিন্তু মনে সেটা রেখা টানতে পারেনি। এখন কেন টানছে?

হঠাৎ খোকার মনে পড়ল ছোট বোন হেলেনের কথা। মনে পড়ল ভুলুর কথা। পোষা বানরটার কথা। আচ্ছা, হেলেন কি ওদের দেখেশুনে রাখতে পারবে? যদিও ও হেলেনকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছে। দেখা যাক। নাহ্! এসব ভাবতে গেলেই চোখ দুটো ভিজে আসে। মনটা শক্ত করতে হবে।

ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল খোকা। হঠাৎ বাবা ওর পিঠে হাত রাখলেন। চমকে উঠল খোকা। বাবা জানতে চাইলেন, 'কী ভাবছিলে খোকা? মন খারাপ?'

ছোট্ট জবাব দিল খোকা, 'উঁহু।'

খোকাকে এবার কাছে টেনে কোলে বসান বাবা। জড়িয়ে ধরেন বুকের মধ্যে। খোকার গালের সঙ্গে গাল মেলান। তারপর খোকার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, 'আমার খোকা বড় লক্ষ্মী ছেলে। খোকার মন খুব ভালো। লেখাপড়া করে খোকা একদিন বড় হবে। অনেক বড় হবে। দেশের জন্য কাজ করবে। মানুষের সেবা করবে।'

বাবার আদর পেয়ে কিছুক্ষণ চুপটি করে থাকে খোকা। হঠাৎ নিজেকে আর সামলাতে পারে না। বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বাবা অবাক হয়ে খোকার মুখটা তুলে ধরেন। তারপর হাসতে হাসতে বলেন, 'এ কী খোকা! কাঁদছ কেন? সবাইকে ছেড়ে আসায় মন খারাপ হয়ে আছে?'

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নেয় খোকা। তারপর কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে, 'এই টুঙ্গিপাড়ায় আবার আমি ফিরে আসব আব্বা। তারপর আর কোথাও যাব না। কোথাও না...।'

হঠাৎ সূর্যটা হারিয়ে যায় আকাশ থেকে। কালো মেঘের আনাগোনা বাড়তে থাকে। নদীর ওখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড জমিনের মতো সূর্যের আলো দেখা যায়। তার মানে ওখানকার আকাশ তখনও মেঘেরা দখল করতে পারেনি। আকাশের দিকে তাকায় খোকা। কে বলবে, খানিক আগেও ঝলমলে রোদ ছিল। এই হলো বর্ষা। বর্ষার এমন রূপ বাংলা ছাড়া আর কোথায় মেলে?

আর ঠিক তখনই খোকাদের বজরার উপর দিয়ে চলতে থাকে সেই মেঘদলটা। হুঁ সেই মেঘদলটা। খনখনে বুড়ো মেঘ আর তার দলবল।

১৩

খক খক খক। খকর খকর খক।

বুড়োটা কাশল নাকি গর্জন করল?

বুড়ো মেঘের দিকে তাকাল সবগুলো মেঘ। তরুণ মেঘেরা তাকাল ভয়ে ভয়ে, আর ছোট্ট মেঘেরা তাকাল কৌতূহলে।

আবারও কাশল বুড়ো মেঘ। খকর খকর খক।

একটা ছোট্ট মেঘ বলল, 'কী দাদু, ঠাণ্ডা লেগে গেল নাকি?'

কাশতে কাশতেই বুড়ো মেঘ বলল, 'শুনেছি বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজলেও নাকি ঠাণ্ডা লাগে না, অথচ...'

একটা তরুণ মেঘ বলল, 'ওটা তো মানুষের জন্য। বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজতে নাকি অনেক মজা।'

আবার কাশতে কাশতে বুড়ো মেঘ বলল, 'কী জানি বাপু। মানুষের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। আমাদের সঙ্গে মেলে না।

আরেকটা ছোট্ট মেঘ বলল, কিন্তু দাদু আমরা থেমে আছি কেন?'

'খক-জা-খক-আ-খকর-নি-খক-খক-না।'

তরুণ আরেকটা মেঘ বিরক্ত হয়ে বলল, 'ধ্যাৎ! মেঘ হয়ে ভেসে বেড়াতে আর ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে নদীর পানিতে একটু হুটোপুটি করে আসি।'

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ছোট্ট মেঘগুলো, 'চলো চলো। আমরাও যাব।'

এবার আর কাশি নয়, সত্যি সত্যি গর্জে উঠল বুড়ো মেঘ, 'খামোস! চুপ করে থাক সবাই। আর একটা কথাও না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মেঘের দলটা। খানিক পরে গুঞ্জন শুরু হলো। সেই গুঞ্জন বাড়তে বাড়তে বাড়তে...

এবার কান পেতে দলের কথা শুনতে চাইল বুড়ো মেঘ। অনেকক্ষণ কান পেতে রইল। নাহ। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ঠাণ্ডা লেগে কান দুটোও বন্ধ হয়ে আছে মনে হচ্ছে। উফ। ঠাণ্ডাটা বড্ড ভোগাচ্ছে বুড়োকে।

হঠাৎ ছোট্ট মেঘেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই তো খোকা। ওই তো খোকা...'

ব্যস। অমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মেঘেদের মধ্যে। খোকা!

বুড়ো মেঘও শুনতে পেল কথাটা। অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'খোকা! এই মধুমতীর মাঝনদীতে খোকা কী করে?'

তরুণ একটা মেঘ বলল, 'খোকা এখন বজরায়। বাবার সঙ্গে গোপালগঞ্জ যাচ্ছে।'

আরো অবাক হলো বুড়ো মেঘ। 'গোপালগঞ্জ! গোপালগঞ্জ কেন? বেড়াতে বুঝি?'

'উঁহু।'

এবার বুঝতে পারল তরুণ আর ছোট্ট মেঘেরা। টুঙ্গিপাড়ার উপর দিয়ে আসার সময় তাহলে বুড়ো কিছুই খেয়াল করেনি। কিংবা দেখেনি। আসলে ঠাণ্ডা লেগেছে বলে চোখ বুজে ছিল বুড়ো। দলের ঠিক মধ্যিখানে ছিল বলে রক্ষা। নইলে উথাল-পাথাল বাতাসে বুড়োটা এতক্ষণে কোথায় উড়ে চলে যেত, তার কী ঠিক আছে? কে আবার তখন বুড়োর খোঁজে বেরোত। দল থেকে একবার কোনো মেঘ হারিয়ে গেলে আর সেই দলে ফিরে আসে না। বুড়ো মেঘ হলে তো কথাই নেই। ফিরে আসা একেবারেই অসম্ভব। তরুণ বা ছোট মেঘ হলেও একটা সুযোগ থাকে। বাতাস ঠেলে ঠিকই নিজের দলে ফিরে আসতে পারে খুঁজে খুঁজে। বুড়ো মেঘকে আবার কেউ দলে ভেড়াতেও চায় না। বুড়োরা নাকি বড্ড খনখনে। বড্ড খিটখিটে। তবে এটা ঠিক, দলটাকে কিন্তু ঠিকঠাক মতো ওই বুড়ো মেঘটাই দেখে রেখেছে। বুড়োটা না থাকলে কবেই দলটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত! একটা দলের মধ্যে থাকা যে কত আনন্দের, সেটা এই মেঘদল ছাড়া আর কে বোঝে! আর বোঝে খোকারা। আহা! খোকা চলে আসায় কতজনের যে মন খারাপ! খোকাদের বাড়ির উপর দিয়ে আসার সময় তো ওরা নিজের চোখেই দেখে এসেছে।

ভুলু তখন বসেছিল বাড়ির সামনের উঠানে। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে একটা বিড়াল বেরিয়ে এলো। এ কী! বিড়ালটা জিহ্বা দিয়ে মুখ চাটতে চাটতে বেরোচ্ছে।

ছোট্ট মেঘগুলো সবই দেখল। একটা ছোট্ট মেঘ অবাক হয়ে বলল, 'বিড়ালটা অমন করে মুখ চাটছে কেন?'

তরুণ একটা মেঘ বলল, 'কেন জানিস না? নিশ্চয়ই রান্নাঘরে ঢুকেছিল।'

'রান্নাঘরে ঢুকলেই মুখ চাটতে হবে?'

'উঁহু। নিশ্চয়ই দুধের হাঁড়িতে মুখ দিয়েছিল। তারপর সবটুকু দুধ খেয়ে নিয়েছে। খাওয়া শেষ করে মুখ চাটতে চাটতে বেরিয়ে এসেছে।'

'কিন্তু ভুলুর সামনে দিয়ে গেল, তবু ভুলু কিছু বলল না কেন?'

'তাই তো! ভুলু কিছু বলল না কেন? বিড়াল দেখলেই তো কুকুর তাড়া করে। এখন কেন করল না?'

ভুলুটা তখনও বুকের মধ্যে মাথা গুজে বসে আছে।

আর বানরটা?

গোয়ালঘরের চালে বানরটা বসে আছে মুখ ভার করে। খোকাদের বাড়ির উপর অনেকক্ষণ ছিল মেঘের দলটা। সেই অনেকক্ষণ বানরটা ওভাবেই ঠায় বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে কয়েকটা পাকা কলা নিয়ে এলো হেলেন। গাছপাকা কলা। কী তার সুবাস! গোয়ালঘরের কাছে গিয়ে হেলেন হাঁক দিল, 'আয় আয়...'

বানরটা তাকাল না পর্যন্ত। তবে কি কলার সুবাস ওটার নাকে পৌঁছায়নি?

তরুণ একটা মেঘ বলল, 'বানরটারও মন খারাপ।'

আশ্চর্য হলো ছোট্ট মেঘেরা, 'পশুদেরও মন খারাপ হয়?'

'হয়ই তো। নইলে ওরা এমন নিশ্চুপ হয়ে আছে কেন?'

'সত্যি!'

'সত্যিই তো! বিশ্বাস না হলে বুড়ো মেঘটাকেই জিজ্ঞেস কর।'

বুড়ো মেঘটা তখন ঝিমুচ্ছিল। কারো কথাতেই সায় দিচ্ছিল না। সায় দেয়ার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু বলত। থাক। বুড়ো মেঘটাকে আর ডাকাডাকি করার দরকার নেই। কিছুক্ষণ পর এমনিতেই হাঁকডাক শুরু করবে। বর্ষার প্রায় সব মেঘই এমন হাঁকডাক করে। হাঁকডাক ছাড়া ওরা চলতেই পারে না।

হঠাৎ একটা বাতাস এলো। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মেঘদলের মধ্যে। একটু নড়েচড়ে উঠল বুড়ো মেঘ। চোখ মেলেই বলল, 'অ্যাই, ধাক্কা মারল কে?'

চটপট জবাব দিল তরুণ মেঘেরা, 'কেউ না, কেউ না।'

'তবে?'

'বাতাস।'

বাতাস শুনেই বুড়ো মেঘ বলল, 'ও আচ্ছা।'

বলেই আবার ঝিমুতে লাগল। বর্ষায় কেন যেন ঝিমুতে খুব ভালো লাগে বুড়োটার।

সামান্য একটু বাতাস এসেই আবার থেমে গেল। বাতাসের সামান্য ধাক্কায় খোকাদের বাড়ি থেকে সামান্য পশ্চিমে সরে এসেছে মেঘের দলটা। তবু খোকাদের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছে ওরা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওই তো বাড়ির বাড় বারান্দাটা দেখা যাচ্ছে। কলা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হেলেন। বানরটা ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না। মা বসে আছেন বারান্দায়। মাদুর পেতে। মায়ের কোলে নাসের। নাসেরকে নিয়ে বড্ড চিন্তায় আছেন মা। সবসময় কোলে কোলে রাখতে হচ্ছে। কোল থেকে নামিয়ে দিলেই নেমে যাচ্ছে উঠানে। ওদিকে উঠানে পানি। কখন যে কী হয়ে যায়! কিন্তু মায়ের মুখটাও তো ভার হয়ে আছে। সকাল গড়িয়ে গেছে সেই কখন। সকাল থেকে কিচ্ছু খাননি মা। কী করে খাবেন! তাঁর খোকা যে নেই। এসময় খোকা থাকলে পুরো বাড়ি মাতিয়ে রাখত। খোকা চলে যাওয়ার পর বাড়িটা কেমন নিঝুম হয়ে গেছে এই সকালেই। মা কেবল ভাবছেন, খোকা এখন কতদূর গিয়েছে? বজরাটা ঠিকমতো চলছে তো? খোকা আবার বৃষ্টিতে ভিজছে না তো!

মেঘদলটা তখনও বুঝতে পারছে না, বাড়িটায় কী হয়েছে? ছোট্ট মেঘগুলো ফিস ফিস করছে, 'গতকাল সকালেও তো কত চঞ্চল ছিল বাড়িটা। বাড়ির উঠানে হইচই করছিল সবাই। ভুলুটাও তো পেটের ভিতর মুখ গুঁজে বসেছিল না। বানরটাও তো লাফালাফি করছিল গোয়ালঘরের চালের উপর। কী হলো আজ?'

কয়েকটা ছোট্ট মেঘ বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

একটা মেঘ বলল, 'বাড়িটাতে তো সবই আছে। তবু মনে হচ্ছে কিছুই নেই। কেন এমন মনে হচ্ছে?'

হঠাৎ একেবারে পুঁচকে একটা মেঘ বলল, 'আচ্ছা, খোকা কোথায়?'

আরে তাই তো! এতক্ষণে যেন টের পেল মেঘের দলটা। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সবাই। খোকা কোথায়?

কিন্তু বেশিক্ষণ খুঁজতে পারল না। তার আগেই দমকা একটা বাতাস

এলো। আর ওই দমকা বাতাস ওদের একটানে নিয়ে এলো মধুমতীর উপর। একেবারে ঠিক সেই বজরার উপর। সেই বজরায় তখন খোকা। খোকার দুচোখ তখনো ভেজা। কিন্তু মেঘের দলটা খোকার ভেজা চোখ দুটো দেখতে পেল না।

১৪

গোপালগঞ্জ শহর। শহরের ব্যাংক পাড়া। রাস্তাগুলো বেশ সরু। এমনই এক সরু রাস্তার দুপাশে দুটো জায়গায় বাড়ি। বড় পুকুরের ধারে খোকাদের অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে। ডানপাশে নারকেল গাছঘেরা বাড়িটায় খোকার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন টিন কিনে এনে সুন্দর করে একটা চৌ-চালা ঘর বানালেন বাবা। কী সুন্দর উঠোন। কত রকম গাছ! বরই, পেয়ারা, লেবু। সঙ্গে আবার একটা শিউলি ও জুঁই ফুলের গাছও আছে। এত সুন্দর ছায়াঢাকা বাড়িতেও কিন্তু মন বসে না খোকার। কেবলই মনটা ছুটে ছুটে যায় টুঙ্গিপাড়ায়। বাতাসছাওয়া বিশাল বিশাল গাছপালা। সাঁকোপাড়ের মাঠ। ওই মাঠে ফুটবল খেলা। খালের পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি। মাছধরা। ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে মেঠোপথ। ধুলোময়। বাইগার নদীর পানিতে রোদের ঝিকিমিকি। আবার জোছনার আলো পড়লে সেই নদীর পানিটা ঝিলমিল করে। পাটগাতি বাজারের হইহল্লা। নিজের ঘর। বন্ধুদের নিয়ে দস্যিপনা। বন্ধুদের ভালোবাসা। মনে পড়ে আর কেমন যেন হয়ে যায় খোকা। গোপালগঞ্জে ওর ভালো লাগবে কেন? মন বসবে কেমন করে?

বাবা বুঝলেন খোকার মন ভালো নেই। মুক্তপাখিকে খাঁচায় বন্দি করলে যেমন হয়, খোকার অবস্থা শহরে এসে তেমনি হলো। কিন্তু লেখাপড়া তো করতে হবে। খোকাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। চতুর্থ শ্রেণিতে। বাড়ি থেকে স্কুলটা বেশ দূরে। পায়ে হাঁটা পথ। স্কুলটা বড় রাস্তা ধরে নদীর ধারে। প্রথম দিনেই বেশকজন বন্ধু জুটিয়ে ফেলল খোকা। খোকার মতো অমন সাহসী আর বন্ধুপরায়ণ ছেলের বন্ধু হতে কে না চায়।

দিন দিন খোকার বন্ধুসংখ্যা বেড়েই চলল। স্কুলে কিন্তু ফাঁকি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। সবসময় লেখাপড়া নিয়ে থাকতে হয়। আগের স্কুলে যখন পড়ত, তখন স্লেটেই লেখাজোখা চলত। এখন কাগজে। সাদা কাগজে

দাগ টেনে কাঠপেন্সিল দিয়ে লিখতে হয়। রোজকার পড়া রোজ করতে হয়। আজ পেটব্যথা, কাল মাথাব্যথা—এসব অজুহাত একেবারেই চলত না। স্কুলের নিয়মকানুনও ছিল বেশ কড়া। ঠিক সময়মতো স্কুলে হাজির থাকতেই হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই পড়তে বসতে হয়। তারপর কিছু খেয়ে স্কুল শেষ করে ফিরতে ফিরতে বিকেল। সন্ধ্যের পর আবার পড়া করতে হয়। একগাদা হোমওয়ার্ক। রোজকার হোমওয়ার্ক রোজই জমা দিতে হয়। প্রতিদিনের পড়া তো ছিলই, তার ওপর হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য, প্রতিদিন এক-দুই পাতা করে বাংলা আর ইংরেজি হাতের লেখাও জমা দিতে হয়। আর আছে গণিত। প্রতিদিন কিছু না কিছু গণিত চর্চা করতে হয় বাড়িতে। নইলে স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের...

থাক, বাকিটা তো যে কেউ জানে। বকাঝকার সঙ্গে বাড়তি আরো কিছু আছে।

গোপালগঞ্জ এসে আরেকটা নতুন বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে খোকা। ব্রতচারী করা।

দেশে তখন ব্রিটিশ শাসন। ইংরেজদের অত্যাচারে বাংলার মানুষ জর্জরিত। দেশে তখন শুরু হয়ে গেছে ব্রতচারী আন্দোলন নামে এক প্রবল ঢেউ। যদিও ব্রতচারী সমিতি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৩৪ সালে। কিন্তু এর ঢেউ শুরু হয়ে গেছে তারও অনেক আগে থেকে। গ্রামের পাঠশালা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্রতচারী চর্চা শুরু হয়ে গেছে। শহর ও উপশহরেও চলছে ব্রতচারী চর্চা। এই ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবক্তা গুরুসদয় দত্ত। গুরুসদয় দত্ত ছিলেন সিলেটের মানুষ। কুশিয়ারা নদী-পারের বীরশ্রী গ্রামে তাঁর জন্ম। কিশোর বয়স থেকেই গুরু ছিলেন দুরন্ত। কাউকে ভয় পেতেন না। আর ছিলেন ভীষণ হৃদয়বান। জাত-পাতের ধার ধারতেন না। তখনকার সমাজ ছিল সংস্কারের বেড়াজালে বন্দি। যে কেউ যে কারোর সাথে মিশতে পারত না, খেলতে পারত না—এমনকি কথাও বলতে পারত না। বড় জাতের মানুষ ছোট জাতের নিজধর্মের মানুষের সঙ্গেও মিশতে পারত না। আর হিন্দু হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে চলবে—অসম্ভব। সে জায়গা থেকে সমাজকে বেরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন গুরু। সকল ধর্মের মানুষের প্রতি, সকল জাতের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সহমর্মিতা। যে কারণে সবার সঙ্গে মিশতেন গুরু। সবার সঙ্গে খেলতেন। অল্প বয়স থেকেই কুস্তি, হা-ডু-ডু, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা—সবকিছুতেই সবাই তাঁর সঙ্গী ছিল। আর সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত জেলেদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। ছোটবেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়ে

বেড়াতেন। আর এসব কারণে অল্প বয়স থেকেই সুঠামদেহের অধিকারী ছিলেন গুরুসদয়। মা-বাবাকে হারিয়েছেন ছোটবেলাতেই। তখন তাঁর অভিভাবক জ্যাঠামশাই। শুধু শরীরচর্চা বা খেলাধুলায় নয়, লেখাপড়াতেও খুব ভালো ছিলেন। বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরলেন। হলেন জেলা প্রশাসক। যখন যে জেলার দায়িত্বে ছিলেন, সে জেলার লোকশিল্প আর সংস্কৃতির সন্ধান করেছেন। জোগাড় করেছেন চিত্রিত মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, নকশি কাঁথা, পটচিত্র, শিল্পিত হাতপাখা, কাজললতা, বালিশ-ঢাকা, বিনুনি বাঁধবার দড়িসহ নানা লোকশিল্পের নিদর্শন। সংগ্রহ করেছেন ভাস্কর্য নিদর্শন, কারুকাজ করা দরজা। মাটি খনন করে বের করেছেন প্রাচীন মূর্তি। দেশের অতীতকে জানার আগ্রহে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রামের পর গ্রাম।

স্বাধীনচেতা এই মানুষটা চাকরিজীবনে পড়েছেন নানান বিড়ম্বনায়। তোয়াক্কা করেননি সরকারি আদেশের। সবসময় নিজের বিবেকের নির্দেশেই চলেছেন। যে কাজটা ভালো মনে হয়েছে করেছেন। আর যে কাজটা খারাপ, সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও সেটা মানেননি। যেমন একবার হাওড়া জেলার লিলুয়াতে কারখানা শ্রমিকদের উপর পুলিশের অতর্কিত গুলি চালানোর বিচারের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। কোনোরকম হুঁশিয়ারি না দিয়ে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালানোর আদেশ দেয়ার জন্য ইংরেজ পুলিশ কর্মকর্তাকেই দায়ী করেন তিনি। আবার যখন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক ছিলেন, তখন গান্ধীজীর লবণ আন্দোলনে যোগদানকারীদের কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশ এলেও কান দেননি। ফলাফল, বদলি। এই বদলিটাই হচ্ছে তাঁর শাস্তি। অন্যায় নির্দেশ না মানার জন্য যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছেন।

উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হয়েও যে বঞ্চনার শিকার তিনি হয়েছেন, সেটা নিয়ে কখনো ভাবতেন না। বরং গুরু ভাবতেন দেশের খেটে খাওয়া মানুষের কথা। তাদের কষ্ট ছিল আরো বেশি। তাদের কষ্টটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিত। এ থেকে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজতেন। এজন্য তিনি মনে করতেন, ছোটবেলা থেকেই দেশের শিশুদের যদি সেভাবে শক্তপোক্ত করে গড়ে তোলা যায়, তবে বড় হয়ে তারা নিশ্চয়ই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস পাবে। এবং একসময় ঠিকই ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেবে এদেশ থেকে। দেশও মুক্ত হবে ব্রিটিশ শোষণ থেকে। বাঙালির দৈহিক-মানসিক গঠন এবং নৈতিক বোধ বাড়ানোর জন্য তিনি এক নতুন ধরনের আন্দোলন শুরু করেন। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত প্রাসঙ্গিক নৃত্যগীত অবলম্বন করেই

এ আন্দোলন। গাঁয়ের নৃত্যভঙ্গিমায় পল্লী গানের সুরে গান বেঁধে দেশীয় রীতিতে ব্রতচারী নৃত্যগীত তৈরি করেছেন তিনি। এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে দেশীয় খেলা।

ব্রত শব্দের অর্থ তপস্যা ও সংযমের সংকল্প। যারা বিশেষ ব্রত নিয়ে চলে, তারাই ব্রতচারী। ব্রতচারীদের প্রথমেই পাঁচটি ব্রতে আস্থা আনতে হয়। একে বলে পঞ্চব্রত। এই পঞ্চব্রত হচ্ছে-জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ। জীবনের পথে জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও কায়িক শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে মানুষের। সত্যনিষ্ঠা সমাজ-জাতি-দেশ এবং সর্বমানবের কল্যাণের সহায়ক। 'ঐক্য' প্রসঙ্গে তো প্রচলিত বচনই রয়েছে—একতাই বল। কিংবা দশে মিলি করি কাজ/হারি জিতি নাহি লাজ। শেষ ব্রত হচ্ছে আনন্দ। আনন্দ যে কোনো কঠিন সাধনাকে সহজ করে।

দেশপ্রেম, ঐতিহ্যপ্রীতি, শিষ্টাচার ও সামাজিক আচরণ কেমন হবে—সে বিষয়েও ব্রতচারীদের জন্য কিছু বিধিমালা আছে। যেমন বাকসংযম, স্বরসংযম, ভাষা ব্যবহারের আদর্শ (খিচুড়ি ভাষায় বলিব না)। রাগ-ভয়-ঈর্ষা-লজ্জা-ঘৃণা বর্জনের নির্দেশও আছে। ব্রতচারী একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলে হাত তুলে বলবে—জয় সোনার বাংলা।

ব্রতচারীরা কেবল নৃত্যগীতের চর্চা করে না, শ্রমসাধ্য কাজে যুক্ত হয়ে সমাজসেবাতেও নিয়োজিত হয়। গুরুসদয় যেমন বলেছেন—

'পরহিতে কিছু শ্রম নিত্য
ব্রতচারীর অবশ্য-কৃত্য'।

এ সকল কাজ শরীর-মনকে সংগঠিত করার পাশাপাশি দেশের সমৃদ্ধিসাধনও করে। আর ব্রতচারীর নিত্য সমৃদ্ধ হবার শপথটা এমন—

'যতদিন বাঁচব ততদিন বাড়ব
রোজ কিছু শিখব রোজ দোষ ছাড়ব
যাহা কিছু করব ভালো করে করব
কাজ যদি কাঁচা হয় শরমেতে মরব'।

শ্রমজীবী মানুষরাই তো গায়ে-গতরে খেটে বাঁচিয়ে রাখে দেশ। ব্রতচারীকে এ কথা সবসময় মনে রাখতে হয় এভাবে—

'যদি তার নাই বা সরে মুখের ভাষা—
ছোটলোক নয় রে চাষা!
চাষির জোরে শক্তি জাতির—
চাষের মূলে দেশে আশা।'

শিশু ব্রতচারীর জন্য রয়েছে বারোটি পণ।

ছু টব খেলব হাসব
স বায় ভাল বাসব
গু রু জনকে মানব
লি খব পড়ব জানব
জী বে দয়া দানব
স ত্য কথা বলব
স ত্য পথে চলব
হা তে জিনিস গড়ব
শ ক্ত শরীর করব
দ লের হয়ে লড়ব
গা য়ে খেটে বাঁচব
আ নন্দেতে নাচব।

এই ব্রতচারী খোকার মনকে অনেকখানি বদলে দিয়েছিল। খোকাকে দিয়েছিল এমন শক্তি, সে শক্তির জোরে ভয়ে কাঁপত অত্যাচারী। খোকার সাহসটা হয়ে গিয়েছিল আকাশের সমান উঁচু।

১৫

জ্যৈষ্ঠের এক বিকেলে হঠাৎ মেতে উঠল টুঙ্গিপাড়া।

বাড়ির উঠোনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে ভুলু। আর ঘেউ ঘেউ শব্দে মাতিয়ে তুলছে। লেজ নাড়ছে কত্তরকমভাবে। একটু পর পর খোকার কাছে এসে গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কতদিন পর প্রিয় মানুষটাকে কাছে পেয়েছে ভুলু।

বানরটা গোয়ালঘরের ছাদ থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছে। বসে আছে বাড়ির বারবারান্দায়। একেবারে মানুষের মতো। ভুলুর কাণ্ডকারখানা দেখছে। আর অপেক্ষা করছে, কখন খোকা ডাকবে।

খোকা আসবে, আগেই জানতেন মা। খোকার জন্য কত্তকিছু তৈরি করে রেখেছেন! বড় বুজি আর মেজ বুজি গাছ থেকে আম পেড়ে রেখেছে গতকাল। পাকা আম। আর হেলেন তিনটে কলা নিয়ে ঘুরছে সেই তখন থেকে। খোকার

হাতে দেবে। উঁহু। খোকা খাওয়ার জন্য নয়, বানরটার জন্য। অনেকদিন পর প্রিয় বানরটাকে নিজের হাতে কলা খাওয়াবে খোকা।

বাড়ির যত্ত ছেলেপুলে আছে, সবাই খেলা বন্ধ রেখে ছুটে এসেছে। কতদিন পর মিয়া ভাইকে দেখতে পেয়েছে ওরা! ওদের প্রিয় মিয়া ভাই। খবরটা অবশ্য কাউকে দিতে হয়নি। বজরা থেকে ঘাটে নামার সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির জেঠুর সঙ্গে দেখা। খোকাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে! আমাদের খোকা নাকি! কতদিন পর দেখলাম বাবা।'

ব্যস। ওইটুকুই। তারপর ওই জেঠুই চেঁচাতে লাগলেন সমানে, 'অ্যাই, তোরা কে কোথায় আছিস, খোকা এসেছে দেখে যা।'

তারপর আর কাউকে জানাতে হয়নি। ঘাট থেকে একটা মিছিল নিয়েই বাড়ির আঙিনায় ঢুকেছে খোকা। খেলার মাঠ থেকে, কাজ থেকে, আমগাছ থেকে, কাঁঠালগাছ থেকে—যে যেখানে ছিল, সেখান থেকেই ছুটে এসেছে। এতদিন পর এসেছে, খোকাকে বুঝি একটিবার দেখবে না?

আর সেই মেঘদলটাও হাজির হয়ে গেছে খোকাদের বাড়ির উপরের আকাশটায়। কোত্থেকে খবর পেয়েছে কে জানে!

খোকার এখন স্কুল ছুটি। গরমের ছুটি দিয়েছে। ছুটি কাটাতে গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া এসেছে খোকা। আর খোকার আসার খবর পেয়েই সাড়া পড়ে গিয়েছে গ্রামে।

আর কী অবাক! সেই মেঘদলটা এসে হাজির খোকাদের বাড়ির উপর।

বুড়ো মেঘটার ইদানীং কী যে হয়েছে, কেবল ঝিমোয়। ঝিমোতে ঝিমোতে বাতাসের দোলায় পুরো দল নিয়ে কখন কোথায় যায়, টেরও পায় না অনেক সময়। হঠাৎ হঠাৎ চোখ খোলে। এই যেমন খানিক আগে হইচই শুনেই চোখ খুলল বুড়ো মেঘ। জানতে চাইল, 'আমরা এখন কোথায়? অনেক দূর চলে এসেছি বুঝি?'

'উঁহু।'

জবাবটা কে দিল দেখতেও চাইল না বুড়ো মেঘ। আবারও জানতে চাইল, 'কোথায় এসেছি?'

'টুঙ্গিপাড়ার আকাশেই আছি।'

'ও আচ্ছা। তা এত হইচই কিসের?'

'বুঝতে পারছি না।'

এবার রাগে গজ গজ করে উঠল বুড়ো, 'একটা খবরও কেউ নিতে পারে

না ঠিক মতো। আকাশে শুধু ঘুরে বেড়ালেই হবে? কিছু খোঁজখবরও তো রাখতে হয়, নাকি?'

এবার ইতিউতি তাকাতে লাগল মেঘগুলো। নাহ। কিচ্ছু বুঝতে পারছে না ওরা। বর্ষার মেঘ হলে আরো কাছে থেকে দেখতে পেত। এখন ওরা খোকাদের বাড়ি থেকে অনেক উপরে। তবে ছোট্ট মেঘগুলোর খুব কৌতূহল। কয়েকটা ছোট মেঘ খানিকটা নিচে নেমে এলো। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে খেউ খেউ করে উঠল বুড়ো মেঘ, 'অ্যাই, এত নিচে নামছিস কেন? শিগগির উপরে উঠে আয় বলছি?'

কিন্তু কে শোনে সে কথা। ছোট্ট মেঘগুলোর বয়েই গেছে বুড়োর কথা শুনতে! আরেকটু নিচে নামল ছোট্ট মেঘগুলো। ওদিকে উপর থেকে বুড়ো মেঘটা আবারও চেঁচিয়ে উঠল, 'উপরে উঠে আয় বলছি। নইলে...'

ওই নইলে পর্যন্তই। এরপর কী সেটা কখনো বলেনি বুড়ো মেঘ। জানলে তো বলবে।

ওদিকে ছোট্ট মেঘগুলোর সাহস দেখে বুড়ো মেঘের শরীর কাঁপতে লাগল। কী বিচ্ছুরে বাবা! কখন যে দমকা বাতাস আসে তার কি ঠিক আছে। দমকা বাতাসের সঙ্গে ডাকু বাতাসও চলে আসতে পারে। যদি ছোট্ট মেঘগুলোকে কোনো ডাকু বাতাস নিয়ে চলে যায়! চোখের পলকে নিয়ে যেতে পারে, যে কোনো সময়।

ওদিকে ছোট্ট ছোট্ট মেঘের ছোট্ট দলটা নিচে নেমেই যাচ্ছে। বুড়ো মেঘটা এবার গর্জে উঠল, 'উপরে আয় বলছি, হতচ্ছাড়া কোথাকার!'

নাহ। বুড়ো মেঘের জন্য কিছু জানবারও উপায় নেই। বড্ড হতাশ হলো মেঘের ছোট্ট দলটা। আবার উপরে উঠে এলো। একেবারে বুড়ো মেঘের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সবাই। বুড়ো মেঘটা তখনও কাঁপছিল। ছোট্ট মেঘেরা বুঝতে পারছিল না, বুড়ো মেঘটা কেন কাঁপছে—ভয়ে নাকি রাগে?

বুড়ো মেঘ বলল, 'তোদের কতদিন বলেছি, দল ছেড়ে বেশি দূরে যাসনে। তবু তোরা কথা শুনছিস না। কী হয়েছে তোদের বল তো?'

একটা ছোট্ট মেঘ বলল, 'নিচে কী হচ্ছে দেখতে ইচ্ছে করছে না বুঝি?'

'কী দেখলি?'

'দেখতে আর পারলাম কই?'

বুড়ো মেঘ বলল, 'তাহলে এতক্ষণ কী করেছিস?'

'দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেখতে পারিনি। পিছন থেকে এত চেঁচামেচি করলে মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখা যায়?'

'হুঁ। আমি বুঝেছি। খোকা এসেছে বাড়িতে। একটু কান পাতলেই শুনতে পারতি।'

এবার সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল মেঘের দলটা। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না।

'কই কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না।'

বুড়ো মেঘ বলল, 'তাহলে দ্যাখ।'

আবার নিচে তাকাল ছোট্ট মেঘেরা। নাহ। কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।

বুড়ো মেঘ এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'এখন দেখবি কেমন করে, দেখছিস না সন্ধ্যে শেষে রাত নেমে গেছে। রাতের বেলা কি নিচে কিছু দেখা যায়?'

আরে তাই তো! আসলেই বুড়ো মেঘটার অনেক বুদ্ধি। বুদ্ধি না থাকলে কেমন করে বুঝল খোকা এসেছে?

হঠাৎ, তখনই হঠাৎ ছোট্ট মেঘেরা শুনল আর সঙ্গে সঙ্গে কান পাতল সবাই। ওই তো নিচে চেঁচামেচি চলছে—'মিয়া ভাই এই যে তোমার জন্য আমের আচার বানিয়েছি আমি।'

'খোকা, মাখনটুকু খেয়ে নাও। শরীরের কী অবস্থা করেছ এ কদিনে!'

'মিয়া ভাই, কাল সকালে খালে যাবে? আমাদের একটা সাঁতার প্রতিযোগিতা আছে, তুমি দেখবে। যাবে তো মিয়া ভাই?'

'উঁহু, মিয়া ভাইকে নিয়ে কাল শাপলা পুকুরে যাব, শাপলা তুলব।'

'আরে ধ্যাৎ, মিয়া ভাইয়ের এখন শাপলা তোলার সময় আছে? আচ্ছা মিয়া ভাই, তোমার কতদিনের ছুটি? ছুটির পরে আবার গোপালগঞ্জ চলে যাবে?'

শুনতে শুনতে কখন যে কথাগুলো হারিয়ে গেল দূরে, টেরও পেল না মেঘের দলটা। টের পাবে কেমন করে? বাতাস যে ওদের টানতে টানতে নিয়ে গেল খোকাদের বাড়ি থেকে দূরে। আরো দূরে। অনেক দূরে।

বিয়ে হয়ে গেল বড়বুজির।

শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় খোকাকে কত্ত কাছে ডাকলেন বড় বুজি। বড় বুজির মুখখানা তখন মায়ের মুখের মতো মমতায় মাখা ছিল। কিন্তু খোকা কেন যেন বড় বুজির ধারেকাছেও ঘেঁষেনি। দূর থেকেই দেখেছে কেবল। কাছে গেলে যে কান্না আটকে রাখতে পারত না। এখন ও গোপালগঞ্জে লেখাপড়া করে। এখন ওকে হাউমাউ করে কান্না করা মানায়? কিন্তু বুজির

কাছে গেলে যে বাঁধ মানত না কান্না। ঝর ঝর করে ঝরেই যেত। তাই তো যায়নি। মা কত্ত বলেছিলেন, 'খোকা, বুজির কাছে যাও একটু। বুজি তোমায় ডাকছে।'

খোকা তা-ও গেল না। মাকে জড়িয়ে ধরে বুজির সে কী কান্না। ওই কান্না দেখে অনেক কষ্টেও চোখের পানি আটকে রাখতে পারল না খোকা।

বুজির সঙ্গে অনেক মানুষ। সুন্দর একটা বজরায় সেই মানুষদের সঙ্গে উঠে পড়লেন বুজি। এতদিনের চেনা মানুষদের রেখে অচেনা মানুষদের সঙ্গে চলে গেলেন বড় বুজি। অনেক দূরে চলে গেলেন।

বিয়ে হয়ে গেল মেজ বুজিরও।

মেজ বুজির বিয়ের সময় তো খোকা অনেক শক্তপোক্ত। কান্নাকাটির বালাই নেই। মেজ বুজি ডাকতেই কাছে গিয়ে হাজির। তবে মুখটা ভার। খোকা ভেবেছিল মেজ বুজির শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়া ও সইতে পারবে। চোখ ফেটে পানি বেরুবে না। সত্যি সত্যি বেরুল না। কিন্তু বুকের বামপাশটায় কী যেন একটা আটকে ছিল। এটা কি তবে কষ্ট?

দুই বুজি নেই। মনটা কিছুদিন বড্ড ভার হয়ে ছিল খোকার। এমনিতে জ্যৈষ্ঠের দুপুরবেলা বেশ অসহ্য লাগে। বড্ড একঘেয়ে। ঘুমোতেও ইচ্ছে করে না, আবার বাইরে বেরিয়ে যে দলবল নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে, সেটাও মন চায় না। শুধু বসে বসে হাই তোলে খোকা। উফ্! বড্ড বিরক্তিকর এই হাইতোলা। হাইতোলা এই দুপুরগুলো যে কবে ফুরোবে? কবে যে আবার গোপালগঞ্জ যাবে? ছুটি ফুরোনোর দিন গুনতে থাকে খোকা।

১৬

১৯৩৪ সাল। খোকা এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেল খোকা।

খোকা অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় বেশ অস্থির হলেন বাবা। জানতে চাইলেন,

'তোমার কী হয়েছে খোকা?'

'মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা।'

'কদিন ধরে?'

'অনেক দিন।'

'এতদিন বলোনি কেন?'

'আপনি অস্থির হবেন, তাই বলিনি।'

'তাহলে তো ডাক্তার দেখাতে হয়।'

'আম্মাকে কিছু বলবেন না। নইলে দুশ্চিন্তা করবেন। কান্নাকাটি করবেন।'

'আচ্ছা, বলব না। আগে ডাক্তার দেখিয়ে নেই।'

পরদিনই খোকাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন বাবা।

খোকাকে ভালো মতো পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, 'খোকার তো বেরিবেরি রোগ হয়েছে। ওর হার্ট দুর্বল হয়ে গেছে। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। ওখানে ভালো চিকিৎসা হবে।'

এবার খোকার জন্য দুশ্চিন্তা হলো বাবার।

আর দেরি করলেন না। খোকাকে নিয়ে ছুটলেন কলকাতা। যদিও কলকাতা যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। প্রথমে যেতে হবে গোয়ালন্দ। সেখান থেকে বড় স্টিমারে চেপে কলকাতা। বাবার সঙ্গে কলকাতা এলো খোকা।

কলকাতায় নেমেই খোকার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কত বড় বড় দালান! বড় বড় রাস্তা! আর মানুষও যে কত্ত রকমের আছে, কলকাতা না এলে খোকা বুঝতই না। কত্ত কত্ত গাড়ি রাস্তায়। কত্ত রকমের।

শিবপদ ভট্টাচার্য। এ কে রায় চৌধুরী। এঁরা কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার। খোকাকে নিয়ে আরো অনেক নামি ডাক্তারের কাছে ছুটলেন বাবা। চলতে থাকে চিকিৎসা। ওষুধ নিয়ে আবার গোপালগঞ্জ। টানা দুই বছর চিকিৎসা চলল খোকার।

এর মধ্যেই সেরেস্তাদার হয়ে বাবা বদলি হয়ে গেলেন মাদারীপুর মহকুমায়। সেটা ১৯৩৬ সাল।

মাদারীপুর যাওয়ার আগে খোকাকে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় এলেন বাবা। টুঙ্গিপাড়ায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল খোকা। টুঙ্গিপাড়া। খোকার প্রিয় টুঙ্গিপাড়া।

আবার সরগরম হয়ে উঠল বাড়ি। খোকাকে ফিরে পেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল সবাই। মিয়া ভাই ফিরে এসেছে। কিন্তু টুঙ্গিপাড়ায় কতদিন থাকবে মিয়া ভাই?

ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন টুঙ্গিপাড়ায় থাকা হলো না। এবার মাদারীপুর যাওয়ার তাড়া। তাড়া না থেকে উপায় আছে? একদিকে বাবার চাকরি। অন্যদিকে খোকার স্কুল। মাদারীপুর গিয়ে নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হবে। আবার নতুন স্কুল!

টুঙ্গিপাড়া থেকে মাদারীপুর অনেক দূর। যেতে হয় লঞ্চ নয়তো বড় নৌকায়। গোপালগঞ্জ থাকতে তো সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি আসা যেত। কিন্তু মাদারীপুর থেকে সেটা সম্ভব নয়। আগের মতো বাড়ি আসতে পারবেন না বাবা।

ওদিকে খোকা অসুস্থ। বাবা তো অফিসে ব্যস্ত থাকবেন। খোকার যত্ন-আত্তি করতে পারবেন না। এবার মাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বাবা।

খবরটা শোনার পর খুব খুশি হলো খোকা। মা-ও যাবেন সঙ্গে! এবার আর আগের মতো মন খারাপ হলো না খোকার। মাকে কাছে পেলে ওর আর কিছু চাই না।

বাবাকে কাছে পেয়ে জানতে চাইল খোকা, 'আমরা মাদারীপুর কিভাবে যাব আব্বা?'

'লঞ্চে।'

নাহ। লঞ্চে যেতে মন চায় না খোকার। জানতে চাইল, 'আর কোনোভাবে যাওয়া যায় না?'

বাবা হেসে জবাব দিলেন, 'যায় তো! বড় নৌকায় করেও যাওয়া যায়।'

এবার খোকার আবদার, 'তাহলে কি আমরা বড় নৌকাতে যাব?'

বাবা মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি কি সেটাই চাও?'

'হুঁ।'

'বেশ।'

ভীষণ খুশি হলো খোকা। ও জানে, ঠিক ঠিক বাবা ওর কথা রাখবেন।

পরদিন মাদারীপুর যাবে ওরা। রাতে কতকিছু ভাবতে লাগল খোকা। এই প্রথম নৌকায় করে দূরে যাচ্ছে ওরা। সঙ্গে মা, নাসের, লিলি, বাকিরা। সবাইকে নিয়ে থাকার মজাই অন্যরকম।

বেশ বড় একটা নৌকা ঠিক করেছেন বাবা। এবার খোকার সঙ্গে মাদারীপুর চলল হেলেন, নাসের আর মায়ের কোলে থাকা ছোট্ট লিলি। নৌকার ভেতর ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে বসল খোকা। নৌকার জানালা খুলে দিল। ওই জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। কিন্তু মন ভরল না। এবার খোকা বেরিয়ে এলো নৌকার ভিতর থেকে। তির তির করে এগিয়ে চলেছে নৌকা। একেবারে মধুমতীর মাঝখান দিয়ে। মাঝিদের হাল বাওয়া দেখতে দেখতে ওর চোখ চলে গেল এদিক ওদিক। নৌকার পিছনে হাল, আর সামনে দুটো দাঁড়। নদীতে আরো কত নৌকা ছুটে চলেছে। কত্ত রকম পাল। পাটবোঝাই নৌকা, যাত্রীবোঝাই নৌকা, মাটির জিনিসপত্র নিয়ে ছুটে চলা

নৌকা। পাটের নৌকা দেখিয়ে বাবা বললেন, 'এগুলো কলকাতা যাবে। কলকাতা থেকে যাবে বোম্বাই (এখন মুম্বাই)। বোম্বাই থেকে বড় জাহাজে বিলেতে—সাহেবদের দেশে।'

দেখতে দেখতে চোখ চলে যায় নদীর পারে। দিগন্তে আঁকা রেখার মতো গ্রাম। অনেক দূরে। স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায়, ওগুলো গ্রাম।

নদীর বাতাস। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়া যায়। বুক ভরে যায় সে নিঃশ্বাসে। খিদেও পায় বেশ। খিদে পেয়ে গেল সবার। নৌকার ভিতর থেকে মা ডাক দিলেন, 'খোকা, কিছু খাবে এসো।'

নৌকার ভিতরে ঢুকে পড়ে খোকা। সঙ্গে করে কত্ত রকম খাবার নিয়ে এসেছেন মা। এখন বের করলেন নারকেলের নাড়ু আর মুড়ি। মায়ের হাতের নাড়ু, কী যে মজা! এক মুঠ মুড়ি মুখের ভিতর চালান করে, নাড়ুতে একটু কামড় বসায় খোকা। কী যে স্বাদ! আহ!

খেতে খেতে জানতে চায় খোকা, 'আমরা মাদারীপুর কখন পৌঁছাব আব্বা?'

জবাব দিলেন বাবা, 'সন্ধ্যে তো হবেই।'

বাহ। শুনে খুব ভালো লাগল খোকার। নৌকায় ঘুরে বেড়াতে ওর বেশ লাগে।

খাওয়া শেষ করে কিছু মুড়ি নিয়ে জানালার কাছে গেল খোকা। ছিটিয়ে দিল পানিতে।

বাবা জানতে চাইলেন, 'কী করছ খোকা?'

'মাছেদের খেতে দিচ্ছি।'

হাঃ হাঃ হাঃ। বেশ শব্দ করে হাসলেন বাবা। খোকার জবাব শুনে মা-ও বেশ মজা পেয়েছেন।

আবার জানতে চাইলেন বাবা, 'মাছেরা খেয়েছে?'

'জানি না।'

অবাক হয়ে বাবা বললেন, 'এ কী! যাদের খাওয়াচ্ছ তারা খাচ্ছে কি না তা-ই জানো না?'

বলেই আবার শব্দ করে হাসলেন।

এবার লজ্জা পেল খোকা। লাজুক গলায় বলল, 'মাছেরা কেমন করে খায় দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখতে আর পারলাম কই।'

'কেন কী হয়েছে?'

'মাছেরই তো দেখা নেই।'

এবার বুঝিয়ে বললেন বাবা, 'মাছের দেখা এভাবে পাবে না। মাছেরা এসময় গভীর পানিতে থাকে।'

মাছেদের জন্য আনা মুড়িগুলোও শেষ। কী আর করা। এবার বাবার পাশে এসে চুপ করে শুয়ে পড়ল খোকা। মাত্র তো দুপুর পেরিয়েছে। সন্ধ্যে হতে ঢের বাকি। এখনও অনেক সময়। তারচেয়ে একটু শুয়ে থাকা যাক।

বাবার পাশে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল খোকা। আকাশ দেখা যাচ্ছে। কী সুন্দর আকাশ। এখানে ওখানে মেঘেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেঘেদের ঘুরে বেড়ানো দেখতে দারুণ লাগে ওর। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা স্টিমার ছুটে গেল। ভোঁ শব্দে চমকে উঠেছিল খোকা। খোকার চমকে যাওয়া খেয়াল করলেন বাবা। বললেন, 'ওটা স্টিমারের শব্দ। ভয় নেই।'

'কিন্তু নৌকাটা এমন দুলছে কেন?'

'স্টিমার চলে যাওয়ার পর বেশ ঢেউ ওঠে। আর সেই ঢেউয়ে নৌকা দুলতে থাকে।'

দুলুনিটা কিন্তু বেশ লাগছে খোকার। মনে হচ্ছে দোলনায় দোল খাচ্ছে। আর দোল খেতে খেতে আবার আকাশের দিকে তাকায় খোকা। আর তখনই খোকার চোখ পড়ল সেই মেঘদলের উপর। হুঁ। সেই মেঘদলটা। যে দলের কর্তা একটা খনখনে বুড়ো মেঘ। বুড়ো মেঘের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো তরুণ মেঘ আর ছোট ছোট মেঘ। দলটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হু হু করে খোকার বুকটা। কেন? খোকা জানে না। মেঘদলটার দিকে তাকিয়ে থাকতেই কেবল ইচ্ছে করছে। মেঘদলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে খোকা ঘুমিয়ে পড়ে, টের পায় না।

১৭

খুব ছোট্ট শহর মাদারীপুর। এখানে ঘরের উপর ঘর। ফাঁকা জায়গা বেশ কম। খোকা ভর্তি হলো মাদারীপুর হাইস্কুলে। সপ্তম শ্রেণিতে।

টুঙ্গিপাড়ার চেয়েও মজা বেশি হওয়ার কথা এখানে। টুঙ্গিপাড়ায় তো বাবা থাকতেন না। মা আর ভাইবোনদের নিয়েই থাকতে হতো। এখানে সবাই আছেন। কেবল বড় আর মেজ বুজি ছাড়া। কিন্তু কেন যেন মাদারীপুরে খোকার মন বসে না। একে তো নতুন স্কুল। পুরনো বন্ধু-বান্ধব নেই। তার ওপর খেলাধুলা করার মতো তেমন মাঠও নেই। স্কুলের সামনে মাঠ বলতে

যা আছে, ওখানে খেলতে ইচ্ছে করে না। টুঙ্গিপাড়ার মতো গাছপালা নেই। নদী আছে, তা-ও অনেক দূরে। এখানে আর নদীর ভেজা বাতাসে গা জুড়োতে পারে না খোকা। রাত নামলে খুব তাড়াতাড়ি নির্জন হয়ে যায় চারপাশ। টানা ঝিঁঝিঁর শব্দে মাথা ধরে যায় রাতের বেলা। আর আছে শেয়ালের ডাক। উফ্! বড্ড বিরক্তিকর। নাহ্! মাদারীপুর খোকাকে খুশি করতে পারল না। লেখাপড়ায়ও মন বসাতে পারল না খোকা। কেন যেন এখানে এসে লেখাপড়া করতেই ইচ্ছে করছে না ওর। স্কুলে যায় ঠিকই, কিন্তু মনমরা হয়ে থাকে। ঘরে ফিরে বইয়ের পাতা ওল্টায় ঠিকই, কিন্তু মাথার ভিতর ঘুরে বেড়ায় টুঙ্গিপাড়ার দিনগুলো। সেই সাঁকোপারের মাঠ। খালে গিয়ে দাপাদাপি। নদীতে মাছধরা। বাঁশের ডগায় বসে থাকা সেই শিকারি মাছরাঙা।

আর, আর কেমন যেন লাগে খোকার। সবকিছু ঠিকমতো ঠাহর করতে পারে না।

একদিন বাবাকে জানালেন মা, 'খোকা তো স্কুলে যেতে চায় না। কী করি?'

বাবা বললেন, 'থাক। যেতে না চাইলে জোরাজুরি করার দরকার নেই। নতুন জায়গা তো, মন বসাতে সময় লাগছে। কিছুদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মা-ও আর এটা নিয়ে কিছু বলেন না। কিন্তু খোকার শরীরটা সেই আগের মতোই রয়ে গেল। আগের মতোই হ্যাংলা-পাতলা।

কিন্তু মায়ের মনটা বড্ড খুতখুঁতে। মায়ের মনে হচ্ছে খোকার কিছু একটা হয়েছে। বাবাকে জানালেন মা। খোকাকে নিয়ে আবার ডাক্তারের কাছে ছুটলেন বাবা।

ডাক্তার নানা রকম প্রশ্ন করলেন খোকাকে। 'খোকা, চোখে কি ঝাপসা দেখো?'

'হুঁ।'

'ঘন ঘন মাথাব্যথা হয়? কিংবা চোখে ব্যথা?'

'হুঁ।'

ডাক্তার বললেন, 'ওকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে।'

বাবার মুখটা মলিন হয়ে গেল। খোকার যে কী হলো!

খবর শুনে মা তো কান্নাকাটি করলেন। কেন যে দুদিন পর পর খোকার এত অসুখ হয়?

বাবাকে বললেন, 'তাহলে আর দেরি করা ঠিক হবে না। আপনি যত শিগগির পারেন কলকাতায় নিয়ে যান।'

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেটাই ভাবছি।'

দেরি করলেন না বাবা। কয়েকদিনের মধ্যেই খোকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আবার কলকাতা। আবার চিকিৎসা।

এবার কলকাতা গিয়ে সোজা মেজ বুজির বাড়িতে উঠল খোকা। খোকার মেজ ভগ্নিপতি চাকরি করেন এজিবিতে মানে একাউন্টেন্ট জেনালের অব বেঙ্গলে। সম্পর্কে খোকার দাদা হতেন। তিনিও শেখ বংশের।

খোকাকে পেয়ে মেজ বুজি কী যে খুশি হলেন! বোনেরা খোকাকে এত্ত ভালোবাসতেন! মনে হলো অনেকদিন পর খোকাকে দেখলেন মেজ বুজি। খোকার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, 'কেমন আছো ভাই?'

খোকার একটু লজ্জা হয়েছে। কেমন যেন লাগছে ওর। কিন্তু মেজ বুজির বাসায় এসেছে বলে কিছু বলতেও পারছে না। টুঙ্গিপাড়ায় থাকলে কখন পালিয়ে যেত! মেজ বুজি ওর নাগালই পেত না।

কলকাতার বিখ্যাত চক্ষু ডাক্তার টি আহমেদ। খোকাকে দেখলেন বেশ যত্ন করে। বাবা উদ্বিগ্ন চেহারায় তাকিয়ে আছেন ডাক্তার সাহেবের মুখের দিকে। দেখা শেষ করে ডাক্তার জানালেন, 'একটু কঠিন রোগই হয়েছে খোকার।'

'কী অসুখ?'

'গ্লুকোমা। বাজে ধরনের রোগ। এ রোগে অন্ধও হয়ে যেতে পারে।'

বাবার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। এত কঠিন রোগ হলো খোকার!

এবার একটু হেসে ডাক্তার বললেন, 'তবে চিন্তার কিছু নেই। আপনি ঠিক সময়ে নিয়ে এসেছেন। দেরি করলে অবশ্যই বিপদ হতো।'

এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বাবা। যাক। খোকা ভালো হয়ে যাবে। বড্ড দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন খোকাকে নিয়ে।

আবার বলতে লাগলেন ডাক্তার, 'এখন যত শিগগির পারা যায় অপারেশন করাতে হবে।'

বাবা জানতে চাইলেন, 'দুচোখেই অপারেশন করাতে হবে?'

'হুঁ। দুচোখেই। দেরি করা যাবে না। আপনি ওকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন। বাকিটা আমি দেখছি।'

হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল খোকা। কিন্তু হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে মোটেই ভালো লাগছে না খোকার। এমন বন্দি থাকতে কার ভালো লাগে? ওদিকে ডাক্তার এসে জানিয়ে গেছেন কাল ভোরেই অপারেশন।

উঁ! কাল ভোরেই অপারেশন! ঘাবড়ে গেল খোকা। কী করা যায় ভাবতে লাগল।

পাশের বিছানার দিকে তাকাল খোকা। আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে ওখান থেকে। এক অপারেশনের রোগী বিছানায় শুয়ে উঁ আঁ করছে। এক চোখ বাঁধা। মনে হয় ব্যথা পাচ্ছে। দেখে আরো ঘাবড়ে গেল খোকা। যে করেই হোক, এখান থেকে পালাতে হবে। দেরি করা ঠিক হবে না। কিন্তু কেমন করে?

বাবা সবসময় ওর দিকে নজর রাখছেন। কখন কী দরকার জানতে চাইছেন। মেজ বুজি এসেও দেখে গেছেন খোকাকে। খোকার কাছে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খোকা চেয়েছিল বাবাই থাকুক ওর কাছে। এজন্যই বাবা ওর দেখাশোনা করছেন।

সকাল হয়েছে সেই কখন! ভোর বেলা বাবা এলেন খোকার কাছে। কিন্তু কোথায় খোকা?

বাবা ভাবলেন হয়তো এদিক-ওদিক গেছে। খোকার বিছানায় বসে রইলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, খোকার কোনো খবর নেই। এবার চিন্তায় পড়লেন বাবা। হঠাৎ হাসপাতালের গেটে হইচই শুনলেন। খোকাকে খুঁজতে খুঁজতে ওদিকে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন বাবা। এ কী! খোকা!

দুজন দশাসই লোক খোকাকে ধরে রেখেছে। আর খোকা ওদের হাত থেকে ছুটতে চাইছে। বাবা জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে?'

একজন দশাসই জোয়ান জবাব দিল, 'হাসপাতাল থেকে রোগী পালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ধরে ফেলেছি।'

বাবা বললেন, 'ও আমার ছেলে। ছেড়ে দিন। আমি দেখছি।'

বলতেই ওরা ছেড়ে দিলেন খোকাকে। বাবা এবার খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। জানতে চাইলেন, 'তুমি পালাতে চাইছো?'

খোকা বলল, 'আমার খুব ভয় করে আব্বা।'

বাবা এবার হাসলেন, 'কেন? ভয় করবে কেন?'

'অপারেশনে খুব কষ্ট, তাই না আব্বা?'

খোকার কথার জবাব না দিয়ে বাবা বললেন, 'আমি তো জানতাম আমার খোকা খুব সাহসী।'

তারপর তাড়া দিলেন খোকাকে, 'চলো চলো। অপারেশনের সময় হয়ে গেছে।'

আর কোনো কথা বলল না খোকা। বাবার সঙ্গে চলে এলো নিজের বিছানায়।

১৮

খোকার অপারেশন হয়ে গেল। তবে একসঙ্গে দুচোখে অপারেশন হয়নি। প্রথমে একটা চোখ। দশদিনের মধ্যে আরেকটা চোখ। যদিও পনের দিন পরে আরেকটা চোখ অপারেশন করার নিয়ম, কিন্তু খোকার চোখের অবস্থা যে ভালো নয়। তাই আর দেরি করলেন না ডাক্তার।

অপারেশনের পর অবাক হয়ে গেল খোকা। আগে দুচোখেই জ্বালা করত। কী যে জ্বলুনি ছিল। চোখ দুটো কট কট করত। মনে হতো কেউ যেন চোখে মরিচগুঁড়ো মাখিয়ে দিয়েছে। আর অপারেশনের পর? সেই জ্বলুনি নেই।

খোকার দুচোখেই ব্যান্ডেজ। চোখ দুটো বন্ধ। খোলার উপায় নেই। বাবা ওর পাশে ছায়ার মতো ছিলেন এ সময়টায়। ওকে খাইয়ে দিতেন। বাথরুমে নিয়ে যেতেন। ওর সঙ্গে গল্প করতেন। এ সময়টায় মেজ বুজি প্রতিদিনই আসতেন ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আর বাড়ি থেকে মজার মজার খাবার পাঠাতেন।

অনেকদিন তো হলো হাসপাতালে। খোকার ব্যান্ডেজ খোলা হলো। আর খোকাকে চশমা দেয়া হলো। আর বলে দেয়া হলো, সারা জীবন চশমা পরে থাকতে হবে খোকাকে। আরো একটা কথা বললেন ডাক্তার। কিছুদিন খোকা লেখাপড়া করতে পারবে না। বেশ কিছুদিন।

মাদারীপুর চলে এলো খোকা। চশমা পরা খোকাকে দেখে নাসের আর লিলি প্রথমে চিনতেই পারেনি। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ওর দিকে। দুষ্টুমি করে বললেন, 'আমার বুড়ো বাবা।'

এবার খোকার খাওয়ার প্রতি আরো বেশি নজর দিলেন মা।

খোকার দিনগুলো কিন্তু খুব একটা ভালো কাটছে না। একে তো লেখাপড়া নেই, স্কুল নেই—সময়ও কাটতে চায় না। তারচেয়ে টুঙ্গিপাড়ায় থাকলে কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। খোকা বায়না ধরল মায়ের কাছে, 'চলেন আম্মা, টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে থাকি।'

অফিস থেকে ফিরলে বাবাকে জানালেন মা, 'খোকা তো টুঙ্গিপাড়া গিয়ে থাকতে চায় কদিন।'

আসলে মায়েরও তেমন ইচ্ছে। নিজের ঘর-দুয়ার ফেলে রেখে এভাবে বিদেশ-বিভূঁইয়ে থাকতে মোটেও ভালো লাগে না মায়ের। থেকেছেন তো খোকার জন্য। খোকার লেখাপড়ার জন্য। এখন খোকার লেখাপড়াই যখন নেই, তখন আর বিদেশে পড়ে থাকা কেন?

বাবা বললেন, 'বেশ। তাহলে তো ভালোই হয়। খোকারও ভালো লাগবে। এখানে খোকার সময়ও কাটতে চায় না।'

কয়েকদিনের মধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় এলো সবাই। সবাইকে রেখে বাবা ফিরে গেলেন মাদারীপুর।

আহ! টুঙ্গিপাড়ায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল খোকা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা পরে ঘুরে বেড়ায়। আগের মতো দাপিয়ে বেড়ায় না। খালের পানিতে ঝাপাঝাপি করে না। তবু তো টুঙ্গিপাড়ায় এসেছে। টুঙ্গিপাড়ায় থাকলেই ভালো লাগে ওর।

তবে ভালো লাগে না বাড়িতে বসে থাকতে। সারা দিন বাড়িতে বসে থাকতে কার ভালো লাগে? খোকা আর কী করে, ঘুরে বেড়াতে লাগল এ বাড়ি ও বাড়ি।

এমনিতেই খোকার আদর যত্ন আর সবার চেয়ে বেশি। বংশের প্রথম ছেলে বলে কথা! তার ওপর গোপালগঞ্জ আর মাদারীপুর গিয়ে লেখাপড়া করছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, খোকা দুবার কলকাতা ঘুরে এসেছে। বাড়িতে খোকার সমীহ বেড়ে গেল। যে বাড়িতেই যায়, সবাই খোকাকে দেখলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর খালারা তো পারলে খোকাকে মাথায় তুলে রাখেন। খোকার আওয়াজ পেলেই হলো, জোর করে টেনে নিয়ে যাবে ঘরে। বারবারান্দায় নিয়ে আদর করে বসাবে। তারপর খোকার সামনে এনে রাখবে নানা রকম খাবার। সবই লোভনীয়। আমসত্ত্ব, নারকেলের নাড়ু, নানান রকম পিঠে, মুড়ির মোয়া, চিড়ার মোয়া। আর খাবারের সময় গিয়ে দ্যাখে খোকার জন্য রান্না করে রাখা আছে মজার মজার খাবার। বড় বড় কই মাছ ভাজা, রুইয়ের পেটির ঝোল, সোনামুগের ডাল দিয়ে রান্না করা রুইয়ের আস্ত মাথা। খাবার পরে দুধের পায়েস তো আছেই। মাখনও বাদ যায় না। এ বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে খেয়ে বেড়ায় খোকা। এছাড়া তো আর কিছু করার নেই। খেয়ে খেয়েই সময় কাটানো ঢের ভালো। মাথাভরা কালো চুল আর চোখে কালো ফ্রেমের চশমাপরা খোকাকে আদর করে না, এমন মানুষ টুঙ্গিপাড়ায় নেই।

কিন্তু এভাবে খেয়ে ঘুরে বেড়াতে আর কতদিন ভালো লাগে? খোকারও আর ভালো লাগল না। আবার মাদারীপুর ফিরে এলো খোকা। এখানেও তেমনই দিন কাটতে লাগল। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই। তবে একটা মজার কাজ পেয়েছে খোকা। কাজটা ওর কাছে মজা লাগলেও, খুব গুরুত্বপূর্ণ। কী কাজ? বিকেলে সভায় যাওয়া।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে তখন আন্দোলনের বাতাস বইছে। বিখ্যাত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারী পূর্ণচন্দ্র দাসের নাম শুনলেই ইংরেজদের বুক শুকিয়ে আসে। পূর্ণ দাসের বাড়ি মাদারীপুর। ব্রিটিশবিরোধী কার্যক্রমের কারণে বেশ কয়েক বছর জেলও খেটেছেন পূর্ণ দাস। মাদারীপুরের বিখ্যাত ব্রিটিশবিরোধী সংগঠন পূর্ণ দাসের পার্টির রমরমা অবস্থা তখন। তবে খোকার কাছে মনে হতো সুভাষচন্দ্র বসুর দলই সবচেয়ে শক্তিশালী। পনের-ষোল বছরের ছেলেরা দলে দলে গিয়ে ভিড়তে লাগল সুভাষ বোসের পার্টিতে।

সুভাষ বোসের দলের আলোচনাসভায় প্রতিদিন বিকেলে হাজির হয় খোকা। ব্রিটিশদের নানা অপকর্মের ফিরিস্তি শোনানো হয় সভায়। আর হয় জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ওসব বক্তৃতা শুনতে শুনতে খোকারও রক্ত গরম হতে শুরু করে। খোকারও মনে হয়, ঠিকই তো—এত দূর থেকে এসে, সাত সাগর তের নদী পাড়ি দিয়ে এই উপমহাদেশে এসে এখানকার মানুষদের শোষণ করার কোনো অধিকার ইংরেজদের নেই। যত তাড়াতাড়ি ওদের তাড়াতে পারব, ততই দেশের মঙ্গল। ততই মানুষের উপকার। মানুষের উপকারের বেলায় এসে খোকার যেন আর তর সইছে না। তবু খোকা চুপ করেই থাকে সভায়। কারো সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলে না। সভায় যেসব বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়, সেগুলোর অনেককিছুই খোকার অজানা। তবে সভার টানে রোজ রোজ যে খোকার হাজির হওয়া চাই।

প্রতিদিন সভায় খোকাকে দেখে নজর পড়ল কয়েক যুবকের। একদিন সভা থেকে বেরুনোর সময় খোকাকে ডাক দিল সেই যুবকের দলটা। 'অ্যাই ছেলে, কী নাম তোমার?'

ছোট্ট করে জবাব দিল খোকা, 'খোকা।'

'বাহ। খুব সুন্দর নাম। তা এখানে কেন আসো প্রতিদিন?'

'আলোচনা শুনতে।'

'কিছু বুঝতে পারো?'

'হুঁ।'

'বেশ। কিন্তু শুধু বুঝলেই তো হবে না। এদেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াতে চাও?'

'চাই তো।'

'খুব ভালো। আমরাও সেটা চাই। এজন্য শুধু আলোচনা শুনলেই হবে না। কিছু কাজও করে দিতে হবে। পারবে তো কিছু করতে?'

খোকার তখন টগবগে রক্তের শরীর। বয়সটাই তো অমন। পারবে না এমন কাজ দুনিয়ায় আছে নাকি? তার ওপর শোষণকারী ইংরেজ তাড়ানোর জন্য যা কিছু করতে হয়, অবশ্যই করবে ও।

ঘাড় নেড়ে জানাল খোকা, 'পারব।'

অন্য এক যুবক বলল, 'এই তো সাবাস। ঠিক আছে। প্রতিদিন আসতে থাকো। দেখি তোমাকে দিয়ে কিছু স্বদেশী কাজ করানো যায় কি না।'

আচ্ছা বলে মাথা নেড়ে চলে গেল খোকা।

এরপর থেকে সভায় এসে আরো বেশি মন দিয়ে কথা শুনতে লাগল খোকা। শুনতে শুনতে খোকার বিশ্বাস জন্মাল, এ দেশে ইংরেজদের থাকার অধিকার নেই। আর সুভাষচন্দ্র বসুর ভক্ত হয়ে উঠল ও। ভীষণ ভক্ত। দেশের স্বাধীনতা আনতেই হবে। এছাড়া এদেশের মানুষের মুক্তি নেই। মুক্তি পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। এ দেশের মানুষের ভালো হয় এমন কিছুই ভিনদেশিরা কোনোদিনও করবে না।

১৯

একদিন বাবা জানতে চাইলেন, 'খোকা, রোজ বিকেলে কোথায় যাও?'

'কেন আব্বা?'

'বা রে, তুমি কোথায় যাও, কী করো, কাদের সঙ্গে মেশো, আমি তো জানতে চাইতেই পারি।'

বাবাকে কী বলবে বুঝতে পারছে না খোকা। মিথ্যে কথা বলবে? উঁহু। ও মিথ্যে বলতে পারবে না। তবে কী বলবে?

বাবা আবার জানতে চাইলেন, 'কথা বলছো না কেন, খোকা? প্রতিদিন বিকেলে কোথায় যাও? বলো?'

নাহ। এবার আর জবাব না দিয়ে পারা গেল না। জবাব দিল খোকা,

'আব্বা, আমি এমন কিছু করছি না, যেটা অন্যায়। ব্রিটিশরা আমাদের শোষণ করছে। ওদের তো এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে।'

বাবা মুচকি হাসলেন। তাহলে তিনি যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। খোকা তাহলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সভায় যায়। এবং...

বাবা বললেন, 'কয়েকদিন গোপালগঞ্জেও গিয়েছ। কেন গিয়েছ?'

খোকা বলল, 'সে খবরও আপনার কাছে চলে গেছে দেখছি।'

'খবরটা কি মিথ্যে খোকা?'

আসলেই খবরটা মিথ্যে নয়। সুভাষ বোসের সব সভা মাদারীপুরে হয় না। গোপালগঞ্জেও কিছু কিছু সভা হয়। এবং খোকা সেখানেও গিয়েছিল। কয়েকদিন। তাহলে সে খবরও বাবা পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এসব খবর বাবা পেলেন কেমন করে?

বাবা এবার মুচকি হেসে বললেন, 'শোনো খোকা, দুনিয়াটা এত সহজ সরল নয়। এসব সভায় যারা হাজির থাকে, তাদের মধ্যেই এমন কেউ আছে, যারা খবরটা সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়।'

এবার যেন পরিষ্কার বুঝতে পারল খোকা। কোনো না-কোনোভাবে পুলিশের কাছে ওদের সভার খবর পৌঁছে যায়। সে না হয় যায়, কিন্তু বাবার কানে কে দিল খবরটা? ভাবতে থাকে খোকা। কিন্তু ভাবনার যে শেষ হয় না। কোনোভাবেই এমন কাউকে খুঁজে পায় না, যে বাবার কানে খবরটা দিতে পারে।

প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল খোকার। আচ্ছা, সবাই কি বুঝতে পারছে না বিষয়টা? এই যে ব্রিটিশরা আমাদের শোষণ করছে, এ সামান্য বিষয়টা সবাই বুঝতে পারছে না কেন? নাকি বুঝেও অনেকে চুপ করে থাকে? হতে পারে। এর সঙ্গে স্বার্থ জড়িয়ে আছে। সবাই কেবল নিজেরটাই ভাবে। সবাই সবারটা ভাবে না। আহা, সবাই যদি সবারটা ভাবত, তবে কি ব্রিটিশরা এদেশে আস্তানা গাড়তে পারত? পারত না। প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশরা কী সুন্দর আমাদের শোষণ করে যাচ্ছে। আর আমাদের কাউকে এমন কিছু সুবিধা দিয়ে রেখেছে যে, আমরা সেই সুবিধার মোহেই সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি।

বাবা বললেন, 'শোনো, খবরটা আমাকে দিয়েছেন তোমার এক দাদা খান সাহেব। আমার কাকা।'

আবার ভাবতে লাগল খোকা, তবে কি খান সাহেব দাদার সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীদের যোগাযোগ আছে? নাহ। মাথাটা কাজ করছে না। খোকা জানতে চাইল এবার, 'দাদা জানলেন কেমন করে?'

বাবা বললেন, 'তোমার দাদাকে জানিয়েছেন গোপালগঞ্জের এসডিও।'

এই রে! পিছনে পুলিশও লেগে গিয়েছে? পুলিশ কি তবে সবই জানে? কিন্তু কেমন করে? ও তো নিজের চোখেই দেখেছে, কতটা সতর্ক আর গোপনভাবে সভা করে ওরা। তাহলে নিশ্চয়ই ভিতর থেকে খবর জানিয়েছে।

বাবা এবার বলতে লাগলেন, 'তোমার দাদাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন এসডিও সাহেব। তোমাকে গোপালগঞ্জে দেখা গিয়েছে দেশবিরোধীদের সঙ্গে। আর যাতে দেখা না যায়। আমাকেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তোমাকে যাতে চোখে চোখে রাখি। আচ্ছা যাই হোক। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, আস্থাও আছে। তুমি কখনো অন্যায় করতে পারো না। অন্যায়কারীকে আল্লাহও ক্ষমা করেন না। যে কোনো কাজ করার আগে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে দেখবে, কাজটা সঠিক কি না। তারপর করবে। এ নিয়ে তোমাকে আমি কখনো বাধাও দেব না, উৎসাহও দেব না। সবটাই তোমার নিজের ওপর ছেড়ে দিলাম।'

এই হলেন খোকার বাবা। বাবার সামনে নিজেকে খুব দুর্বল মনে হয় খোকার। বাবার আত্মবিশ্বাস, বাবার ব্যক্তিত্ব—সব সময়ই মুগ্ধ করে খোকাকে। বাবার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল খোকা।

বাবা বললেন, 'তোমার চোখের অবস্থা এখন কেমন?'

ছোট্ট করে জবাব দিল খোকা, 'ভালো।'

'ব্যথা আছে আর?'

'না।'

'বেশ। যত দ্রুত সুস্থ হবে, ততই মঙ্গল। পড়াশোনাটা আবার শুরু করতে পারবে। তোমার পড়াশোনা নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তিত।'

খবরটা হঠাৎ করেই পেল খোকা। খবরটা পেয়ে বেশ খুশি হলো ও। বাবা আবার গোপালগঞ্জে বদলি হয়েছেন। বাবা বদলি হওয়া মানে তো বাবার সঙ্গে ও নিজেও থাকবে। মাদারীপুর ওর ভালো লাগে না। গোপালগঞ্জ ওর কত প্রিয়! মনে মনে গোপালগঞ্জ যাওয়ার দিন গুনতে থাকে খোকা।

২০

আবার গোপালগঞ্জ। খোকা অবশ্য পুরনো স্কুলেই ভর্তি হতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা রাজি হননি।

বাবার কাছে আবদারও করেছিল খোকা, 'আমি পুরনো স্কুলেই ভর্তি হতে চাই। গোপালগঞ্জ হাইস্কুলে।'

বাবা বললেন,' উঁহু। আমি তোমাকে ওখানে ভর্তি করাব না।'

'কেন?'

'তোমার খারাপ লাগবে।'

বাবার কথা বুঝতে পারল না খোকা। জানতে চাইল, 'আমার খারাপ লাগবে কেন? বরং ভালো লাগবে। ওখানে আমার পুরনো বন্ধুদের দেখা পাব।'

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'ওজন্যই তো খারাপ লাগবে খোকা। তোমার পুরনো বন্ধুরা সব উপরের ক্লাসে। আর তুমি ওদের চেয়ে অনেক নিচের ক্লাসে—সপ্তম শ্রেণিতে। তোমার বন্ধুরা যদি তোমাকে এড়িয়ে চলে? চলতেই পারে। কারণ পড়াশোনায় তো ওরা তোমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। তখন তোমার খারাপ লাগবে না বুঝি?'

তাই তো! কথাটা ঠিকই বলেছেন বাবা। বাবা এতকিছু ভাবেন ওকে নিয়ে! বেশ অবাক লাগল খোকার। আর খুব ভালোও লেগেছে।

জানতে চাইল খোকা, 'তাহলে কোন স্কুলে ভর্তি হব?'

বাবা বললেন, 'গোপালগঞ্জের সবচেয়ে নামি আর ভালো স্কুলেই তোমাকে ভর্তি করাব। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল।'

খুশি হয়ে গেল খোকাও। বলল, 'এই স্কুলের নাম কত্ত শুনেছি! স্কুলের সামনে মাঠও আছে বিশাল। খেলাধুলাও করা যাবে।'

বাবা বললেন, 'এবার আর শুধু খেলাধুলা নয়। পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে হবে বেশি করে। তোমার তো চোখও ভালো হয়ে গেছে। পড়ালেখা করতে আর অসুবিধা নেই। কাজেই পড়ালেখায় সময়টা বেশি দেয়ার চেষ্টা করবে।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল খোকা, 'ঠিক আছে আব্বা।'

বাবা বললেন, 'তোমার জন্য একজন প্রাইভেট টিউটরও ঠিক করেছি। সকাল বিকাল দুবেলা তোমাকে দেখবেন।'

জানতে চাইল খোকা, 'উনি কোথায় থাকেন?'

বাবা বললেন, 'থাকেন না। থাকবেন। আমাদের বাসাতেই থাকবেন। এখানে থাকলে তোমাকে দেখাশোনা করা সহজ হবে তাঁর জন্য। এটাই কি ভালো হয় না খোকা?'

'হুঁ। ভালো হয়।'

সত্যিই ভালো হয়। খোকাও চাইছিল খুব ভালো করে লেখাপড়া করতে। টানা তিনবছর লেখাপড়া করতে পারেনি। চোখের অসুখটা ওকে অনেক ভুগিয়েছে। অনেক তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছে। আর কত! এবার মন দিয়ে শুধু পড়াশোনা। পড়াশোনার প্রতি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হলো খোকার মনে।

এবার জানতে চাইল খোকা, 'শিক্ষকের কী নাম আব্বা?'

বাবা বললেন, 'কাজী আবদুল হামিদ। হামিদ মাস্টার নামেই সবাই চেনে। খুব ভালো মানুষ। ভালো শিক্ষক তো অবশ্যই। তোমার ভালো লাগবে।'

সত্যি সত্যি হামিদ মাস্টারকে বেশ ভালো লেগে গেল খোকার।

একদিন খোকা দেখল ওদের গোপালগঞ্জের বাড়িতে নতুন একটা ঘর উঠছে। নতুন ঘর কেন?

বাবা কাছেই ছিলেন। নতুন ঘর তৈরি দেখভাল করছিলেন। খোকা গিয়ে জানতে চাইল, 'নতুন ঘর কার জন্য আব্বা?'

বাবা বললেন, 'তোমার নতুন মাস্টারের জন্য।'

নতুন মাস্টারের জন্য নতুন ঘর!

ঘর তৈরি হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। আর একদিন হামিদ মাস্টার এসে হাজির। সোজা গিয়ে উঠলেন নিজের জন্য বানানো নতুন ঘরটায়।

ঘর গোছানোর পর খোকা উঁকি দিল মাস্টারের ঘরে। মাস্টার তখন বসেছিলেন বিছানার উপর। ডাক দিলেন, 'খোকা নাকি? ভিতরে এসো।'

ঘরে ঢুকল খোকা। বাহ। কী সুন্দর করে ঘরটা সাজিয়েছেন হামিদ মাস্টার। দেয়ালে ঝোলানো বিখ্যাত মানুষদের ছবি। শেলফে কত্ত বই! হামিদ মাস্টারের ঘরটা খোকার খুব ভালো লেগে গেল। এ ঘরে এসে শুধু সকাল বিকাল কেন, সারা দিন পড়তেও ওর আপত্তি নেই।

পরদিন সকাল থেকেই হামিদ মাস্টারের কাছে পড়তে শুরু করে দিল খোকা। হামিদ মাস্টার যখন পড়ান, মনে হয় কোনো শিক্ষক পড়াচ্ছেন না। মনে হয় কোনো বন্ধু যেন পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছে অপর বন্ধুকে। যখন শাসন করেন, তখন কিন্তু আবার শিক্ষক হয়ে যান হামিদ মাস্টার। যখন গল্প করেন, তখন আবার ঈশপ-অ্যান্ডারসন কিংবা দাদি-নানির মতো গল্পবলিয়ে হয়ে যান। এই হামিদ মাস্টার ছিলেন সূর্যসেনের ভক্ত। যুক্ত ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। গান্ধীজীর ভক্ত। নিজের জানা সকল বিষয় মেলে দিয়েছেন খোকার জন্য। যেন নিজের জ্ঞানের

ডালিখানা সাজিয়ে খোকার সামনে মেলে দিয়ে বলছেন, যত পারো এখান থেকে তুলে নাও খোকা।

হামিদ মাস্টারের এ কৌশলটা কি খোকা বুঝতে পেরেছিল? পেরেছিল। নইলে হামিদ মাস্টারের এত প্রিয় হলো কেন ও।

প্রতিদিন ভোরে হামিদ মাস্টারের সঙ্গে হাঁটতে বেরোয় খোকা। হামিদ মাস্টার বলেন, 'ভোরের এই হাঁটায় বুদ্ধির ঝাঁপি খোলে। কেন জানো খোকা?'

'কেন?'

হামিদ মাস্টার বললেন, 'নদীর পারের এই যে বিশুদ্ধ বাতাস ফুসফুস হয়ে তোমার রক্তে মিশে যাচ্ছে। তারপর রক্ত থেকে চলে যাচ্ছে তোমার মস্তিষ্কে, মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ যত বেশি হবে, ততই সে কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। ততই সে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, তোমার শরীরটাও ফিট থাকবে। প্রচুর খিদে পাবে। প্রচুর খেতে পারবে। আর খাবারটাও হজম হবে দ্রুত। ভোরবেলাকার নদীর বাতাসের মতো উপকারী কিছু আর দ্বিতীয়টি নেই খোকা। কাজেই...'

বাকিটা খোকাই বলে দিল, 'যত পারো নদীর বিশুদ্ধ বাতাস খাও।'

ওর পাশে জোরে জোরে হাঁটছেন হামিদ মাস্টার। খোকা হামিদ মাস্টারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একটা মানুষ এত কিছু জানে কেমন করে? কী জানেন না হামিদ মাস্টার? যেন একটা অ্যানসাইক্লোপিডিয়া। যে বিষয়েই হামিদ মাস্টারের কাছে জানতে চেয়েছে খোকা, বেশির ভাগেরই জবাব পেয়েছে। শুধু তাই নয়, হামিদ মাস্টার যে মনের দিকে থেকে কতখানি বড়, সেটারও প্রমাণ পেল কিছুদিন বাদেই। আর হামিদ মাস্টারও যে ওকে কতখানি স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন, সেটারও প্রমাণ মিলল।

২১

মুসলমানদের খারাপ অবস্থা প্রায়ই চোখে পড়ে খোকার। ও দেখেছে, বেশিরভাগ মুসলিম ছেলেরা ঠিকমতো স্কুলে আসতে পারে না। যারা নিয়মিত আসে ওদের মধ্যে আবার বেশিরভাগ ছেলেই পড়ালেখায় অতটা মনোযোগী নয়। আবার যারা মনোযোগী তাদের মধ্যে কয়েকজনের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। বই-খাতা কিনতে পারা তো পরের কথা, ঠিকমতো স্কুলের বেতনই দিতে পারে না। তাই বলে কি ওরা লেখাপড়া করবে না? ওদের জন্য তো কিছু

একটা করা দরকার। কিন্তু কী করবে? নিজে থেকে যতখানি সাহায্য করা সম্ভব, সেটুকুতে হবে না। আরো সহযোগিতা চাই।

একদিন হামিদ মাস্টারকে জানাল খোকা, 'ওদের জন্য কিছু করতে চাই, স্যার।'

হামিদ মাস্টার মুচকি হেসে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাহ। আমিও তো অনেকদিন ধরে এ বিষয়টা নিয়ে ভাবছি। এবং একটা উপায়ও বের করেছি। মনে হচ্ছে ওদের জন্য কিছু করতে পারব।'

জানতে চাইল খোকা, 'সেটা কী স্যার?'

'মুষ্টিচাল।'

বুঝতে না পেরে জানতে চাইল খোকা, 'মানে?'

'মানে মুষ্টিচাল জোগাড় করে, সেই চাল বিক্রির টাকা দিয়েই জোগাড় হবে গরিব ও অসহায় মুসলিম ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচ।'

'বাহ। কী দারুণ বুদ্ধি।'

'হুঁ। প্রতি ঘর থেকে একমুঠো চাল জোগাড় করা তো কষ্টের কাজ নয়। যে কেউ দেবে। কেন দেবে না? অর্থ সাহায্য তো আর করতে হচ্ছে না। সপ্তাহে একদিন মাত্র একমুঠো চাল। খুব বেশি কিছু তো নয়? আমাদের এ সংগঠনের নাম হবে 'মুসলিম সেবা সমিতি।'

নামটাও খুব পছন্দ হলো খোকার। মুগ্ধ হয়ে হামিদ মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইল ও।

হামিদ মাস্টার বললেন, 'দেখো খোকা, কাজ কিন্তু তোমাকেই করতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল জোগাড় করা। সেই চাল বিক্রির ব্যবস্থা করা। কোন কোন ছাত্রের সমস্যা যাচ্ছে, সত্যিকারের অভাবি ছাত্রদের খুঁজে বের করা এবং তাদের যার যা দরকার, সেটা কিনে দেয়া। পারবে তো?'

'পারব স্যার।'

শুনে খুব খুশি হলেন হামিদ মাস্টার। খোকা যখন বলেছে পারব, তখন ও অবশ্যই পারবে। এ বিশ্বাস তাঁর আছে। তবু একবার বললেন, 'দেখো, আমাদের যেন কোনো বদনাম না হয়। তাহলে অসহায় ছাত্রদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। অনেকের জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

একটা দল বানিয়ে ফেলল খোকা। প্রত্যেক রবিবার এ দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে থলে। বাড়ি বাড়ি ছুটে যায়। আর একমুঠো করে চাল জোগাড় করে। দিন শেষে সে চাল এনে জমা করে হামিদ মাস্টারের কাছে। স্কুলে কোন ছাত্রের খাতা নেই, কার বই নেই, কে কলম কিনতে পারে না—সব

কিছুর তালিকা বানায়। গুরুত্ব অনুসারে তাদের সাহায্য করে। আবার অনেক মুসলিম ছাত্র অনেক দূর থেকে আসে। থাকার জায়গা নেই। ওদের জন্য জায়গিরও ঠিক করে দেন হামিদ মাস্টার। জায়গির ঠিক করার কাজটাও খুব কঠিন। নতুন কোনো ছাত্রকে হুট করে কেউ বিশ্বাস করে বাড়িতে ঠাঁই দিতে চায় না। হামিদ মাস্টার সেসব বাড়িতে গিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে জায়গির ঠিক করেন। হামিদ মাস্টারের প্রত্যেক কাজে খোকা পাশে থাকে। মাস্টারের কাজের ধরন ওর খুব পছন্দ। পড়ানোর ভঙ্গিটাও প্রিয়।

বাংলা গল্প বা কবিতা পড়ানোর সময় কী সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন। প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দেন। কেন শব্দটা বাক্যে ওভাবে এলো, সেটাও বোঝান। ব্যাখ্যা করে দেন বাক্য। বোঝানোর সময় লেখকের অন্য কোনো লেখার উদ্বৃতি দেন। বোঝা যায়, প্রচুর পড়ার অভ্যাস রয়েছে হামিদ মাস্টারের। ভূগোলটা খুব বিরক্তিকর লাগত খোকার। কিন্তু হামিদ মাস্টার এমনভাবে বোঝান, যেন চোখের সামনে জায়গাটা ভেসে ওঠে। মনে হয় পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়। আর গণিত? হামিদ মাস্টারের মতো এত সুন্দর করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে গণিত বোঝাতে আর কাউকে দেখেনি খোকা।

ইতিহাসের কত গল্প যে হামিদ মাস্টারের মনে আছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। একদিন শোনালেন সিরাজউদ্দৌলার গল্প। সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের ছেলে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব। ইংরেজদের আগ্রাসন মোটেই বরদাস্ত করতেন না তরুণ নবাব সিরাজ। তিনি দেখতে পেলেন, এই ইংরেজরা তাঁর দেশের মানুষকে গোলাম করে রাখতে শুরু করেছে। বাণিজ্য করার নামে শোষণ শুরু করে দিয়েছে। এদেশের মানুষের সঙ্গে চাকরের মতো ব্যবহার করছে। যখন তখন যার তার গায়ে হাত তুলছে। নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। মোটেই পছন্দ হলো না সিরাজের। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন নবাব। কিন্তু নিজেদের লোকেরাই চক্রান্ত করে হাত মেলাল ইংরেজদের সঙ্গে। ওই চক্রান্তেই হেরে গেলেন নবাব। পলাশীর আমবাগানের লড়াইয়ে আর জেতা হলো না তাঁর। বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ডুবে গেল। দেশটা দখল করে নিল ভিনদেশি বণিকরা। দেশের মানুষ গোলাম হয়ে গেল ইংরেজদের।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেগে উঠল দেশের মানুষ। ইংরেজদের মতো সুশিক্ষিত সেনাদল নেই, তাতে কি! নিজেদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেল এদেশের অনেক মানুষ। যেমন তিতুমীর। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন। তিতুমীরের বাঁশের

কেল্লার ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন হামিদ মাস্টার, কীভাবে যুদ্ধটা হয়েছিল। একদিন শোনালেন ক্ষুদিরামের কথা। অসম সাহসী কিশোর ছিল ক্ষুদিরাম। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে। বোমা ছুঁড়ে মেরেছিল ইংরেজ সাহেবকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো।

ক্ষুদিরামের গল্প বলতে বলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন হামিদ মাস্টার। খোকা বুঝল, হামিদ মাস্টার আসলে দেশকে ভালোবাসেন সত্যিকার অর্থেই। দেশের মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি নিজেও গান্ধীজীর ভক্ত। ছিলেন সূর্যসেনের শিষ্য। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।

এমন শিক্ষক পাওয়া সত্যিই খুব ভাগ্যের ব্যাপার। মনের সঙ্গে মিল, মতের সঙ্গে মিল। অসাধারণ তাঁর পড়ানোর রীতি। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুর সম্পর্ক। কারো বিপদ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন সে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। এমন শিক্ষকের সঙ্গে খোকার বন্ধুত্ব না হয়ে পারে না। খোকাও তখন হামিদ মাস্টার ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। তাঁর আদর্শ শিক্ষক হামিদ মাস্টার। আর মানুষকে সহজে আপন করেও নিতে জানেন।

হামিদ মাস্টারের ঘরটা তো প্রথম দিন থেকেই খোকার প্রিয় হয়ে আছে। ঘরে না থাকলেও স্যারের ঘরে গিয়ে বসে থাকে খোকা। স্যারের ঘরে খোকার যে কোনো সময় ঢোকার অনুমতি আছে। স্যারের শেলফে থাকা বইগুলো পড়তে শুরু করে খোকা। কিন্তু একদিন হুট করে হারিয়ে যাবেন হামিদ *মাস্টার, ভাবেনি খোকা।*

২২

কদিন ধরেই বেশ কাশি হচ্ছিল হামিদ মাস্টারের। দমকে দমকে কাশি। রাতের বেলা কাশিটা বেশি ওঠে। চিন্তায় পড়ে গেল খোকা। কী হলো স্যারের?

সেদিন খোকাকে কী যেন পড়াচ্ছিলেন মাস্টার। হঠাৎ কাশতে শুরু করলেন।

জানতে চাইল খোকা, 'স্যার, আপনার কি শরীর খারাপ?'

জবাব দিলেন না হামিদ মাস্টার। কিভাবে দেবেন? কাশির চোটে কথাই

বলতে পারছিলেন না। কাশতে কাশতে স্যারের চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছিল। কাশি থামলে কোনো রকমে বললেন, 'হুঁ।'

'তাহলে আজ চলে যাব? আপনার শরীর সুস্থ হোক, তারপর না হয়...'

কাশতে কাশতেই বললেন, 'উঁহু। পড়ানো তো শেষ হয়নি।'

আবারও কাশতে শুরু করলেন। কাশতে কাশতে চলে গেলেন বাথরুমে। ফিরে এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর বিড় বিড় করে কিছু একটা বললেন। শুনতে পায়নি খোকা। স্যারকে কি জিজ্ঞেস করবে, কী বলেছেন?

স্যারের দিকে তাকাল খোকা। চোখ বুজে শুয়ে আছেন। মনে হলো কষ্ট চাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন। খোকা অপেক্ষা করে আছে।

অনেকক্ষণ পর চোখ মেললেন স্যার। এ কী! স্যারের চোখদুটো লাল হয়ে আছে। টকটকে লাল। এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে বাবাকে জানাল খোকা। বাবা ছুটে এলেন হামিদ মাস্টারের ঘরে।

খবরটা বিকেলে জানল খোকা। হামিদ মাস্টারের যক্ষ্মা হয়েছে।

যক্ষ্মা!

খুব কষ্ট লাগল ওর। হামিদ মাস্টারের মতো এত চমৎকার একজন মানুষের যক্ষ্মা! ও মেনেই নিতে পারছে না।

বাবার কাছে জানতে চাইল খোকা, 'হামিদ স্যার সুস্থ হবেন তো, আব্বা?'

বাবা কিছু বললেন না। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেললেন। তাহলে কি সবাই যা বলাবলি করছে সেটাই হবে?

শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মার কাছে হেরে গেলেন হামিদ মাস্টার।

প্রিয় মানুষটাকে হারিয়ে খুব কষ্ট পেল খোকা। স্যারের ঘরে ঢুকলেই বুক ফেটে কান্না আসে ওর। ভালো মানুষদের এত তাড়া কিসের কে জানে! কেন যে তাঁরা দুনিয়ার হিসেব মিটিয়ে চটজলদি চলে যান?

স্যারের বইগুলো তাকিয়ে থাকে খোকার দিকে। খোকা বইগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। স্যারের স্পর্শ পাওয়ার চেষ্টা করে। দেয়ালে ঝোলানো গান্ধীজীর ছবির দিকে তাকায়। স্যারের মুখটা ভেসে ওঠে খোকার চোখে। হাত দিয়ে ধরে দেখে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা। স্যারের কথা মনে পড়ে। মুসলিম ছাত্রদের জন্য স্যার যে উদ্যোগটা নিয়েছিলেন, কত ছাত্র যে উপকৃত হয়েছিল! আরো কত ছাত্র আছে, ওদের কী হবে? স্যার নেই, তাই বলে কি স্যারের উদ্যোগ থেমে থাকবে? উঁহু। তা তো হয় না। স্যারের কাজটাকে এগিয়ে নিতে হবে। তবেই তো হামিদ স্যার বেঁচে থাকবেন আরো অনেকদিন।

সবাই ভেবেছিল হামিদ মাস্টারের মৃত্যুর পর 'মুসলিম সেবা সমিতি'র কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু না। এবার সমিতির হাল ধরল খোকা। ওইটুকুন খোকা। এটা ঠিক, ক্লাসের অন্য ছাত্রদের তুলনায় খোকার বয়সটা একটু বেশি। তিন-চার বছর পড়াশোনা করতে না পারায় ক্লাসের সবচেয়ে বয়সী ছাত্র খোকা। ছাত্রদের অভিভাবকের মতো ও। ওদের ভালোমন্দ তো ওকেই দেখতে হবে। হামিদ স্যার তো ওকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। ওকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, কেমন করে অসহায়দের সাহায্য করতে হয়। স্যারের শেখানো কাজটা তো আর বন্ধ রাখা যায় না।

হামিদ মাস্টারের অসুস্থতা আর মৃত্যুর কারণে কিছুদিন স্থগিত ছিল মুসলিম সেবা সমিতি। আবার নতুন করে শুরু করল খোকা। এবার পুরো দায়িত্বটা তুলে নিল নিজের কাঁধে। একটা কমিটি তৈরি করল খোকা। স্কুলের একজন মুসলিম শিক্ষককে বানাল সমিতির সভাপতি। আর নিজে হলো সম্পাদক। স্কুলের কিছু মুসলিম ছাত্র নিয়ে আবার বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করল। প্রতি রবিবারে। জোগাড় করতে লাগল মুষ্টিচাল। সে চাল বিক্রি করে টাকা-পয়সা জমা রাখল সমিতির সভাপতির কাছে। সভাপতিই সে সাহায্য বিতরণ করতে লাগলেন।

তবে এবার বেশ কিছু ঝামেলায় পড়ে গেল খোকা। অনেক মুসলমান বাড়ি থেকে সাহায্য পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এক বাড়িতে তো রীতিমতো ঝগড়াই করল খোকা। একমুঠো চাল চাইতেই খেউ খেউ করে উঠলেন বাড়ির কর্তা, 'কিসের সাহায্য? যাও যাও।'

বোঝানোর চেষ্টা করল খোকা, 'দেখুন সাহেব, আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা না করি, তাহলে তো মুসলমানরা পিছিয়ে থাকবে।'

এবার খেপে গেলেন বাড়ির কর্তা, 'তুমি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছো? বলি পড়তে এসেছ নাকি চাঁদাবাজি করতে এসেছ। এসব না করে বরং ঘরে গিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করো।'

প্রচণ্ড রাগ হলো খোকার। আর মনে মনে ঠিক করে ফেলল কী করতে হবে।

খানিক পরে দলবল নিয়ে আবার হাজির হলো খোকা। এবার দলবল দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন বাড়ির কর্তা। তবু খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কী চাই?'

'একমুঠো চাল।'

'বলেছি তো দেব না।'

'কেন দেবেন না?'

'আমার ইচ্ছে।'

'দিতে হবে।'

'একমুঠো চালের জন্য এত বড় দলবল নিয়ে এসেছ? লজ্জা করে না তোমার?'

'লজ্জা তো সাহেব আপনার হওয়া উচিত। একমুঠো চালের জন্য দলবল নিয়ে আপনার কাছে আবার আসতে হলো। মাত্র একমুঠো চাল। সপ্তাহে মাত্র একমুঠো চালের ভাত কম খেলে কী এমন ক্ষতি হবে আপনাদের? কিন্তু আপনার একমুঠো চালে...'

পুরোটা বলতে দিলেন না খোকাকে। তার আগেই বলে উঠলেন গৃহকর্তা, 'থাক। তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। একবার যখন বলে দিয়েছি দেব না, তখন দেবই না। পারলে কিছু করো। আর এজন্য কিন্তু তোমার বাবার কাছে নালিশ জানাব আমি। তোমার বাবা তো অতিসজ্জন ব্যক্তি। গোপালগঞ্জে তোমার বাবাকে চেনে না এমন মানুষ নেই। তার ছেলে হয়ে তুমি এ কাজ করছো? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

আরো কিছু বলতে চেয়েছিল খোকা। দলের বাকিরা খোকাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

প্রচণ্ড রাগ হলো খোকার। মানুষ এত ছোটলোক হয় কেমন করে? সামান্য সাহায্য। সেটাতেই এত আপত্তি? আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা।

কিন্তু কী মজা দেখাবে খোকা? আশপাশে তো এমন মানুষ কম নেই। সব অঞ্চলেই কিছু না কিছু আছে। খোকার রাগ বলে কথা!

সে রাতে হঠাৎ ঠাস ঠাস শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠল সে বাড়ির সবাই। কী হচ্ছে এসব?

প্রথমে ভেবেছিল বুঝি গোলাগুলি হচ্ছে। কিন্তু খানিক পরে বুঝতে পারল, উঁহু। কারা যেন তাদের টিনের চালে ঢিল মারছে। ইয়া বড় বড় ইটের টুকরো। আধলা ইটও মেরেছে। সে শব্দেই জেগে গিয়েছে সবাই। কাঁচা ঘুম থেকে জাগলে খুব খারাপ লাগে। তার ওপর টিনের চালে ঢিল মারার শব্দ, বড্ড বিদঘুটে। অমন শব্দে ঘুম তো ভাঙবেই। কিন্তু কারা মারছে ইট?

তখনই মনে পড়ল গৃহকর্তার। বলতে লাগলেন, 'এ নিশ্চয়ই ওই বেয়াড়া ছেলেটার কাজ।'

গৃহকত্রী বললেন, 'কোন ছেলেটা?'

'ওই যে আজ সকালে চাল চেয়ে গিয়েছে। প্রথমবার নিষেধ করেছিলাম।

এরপর দলবল নিয়ে এসেছে। তবু কাজ হয়নি দেখে রাতে ইট মারছে টিনের চালে।'

গৃহকত্রী বললেন, 'মাত্র তো একমুঠো চাল। দিয়ে দিলেই হতো।'

এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল গৃহকর্তা, 'উঁহ। দিয়ে দিলেই তো হতো। আজ একমুঠো চাল চাইছে। কাল যে টাকা চাইবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে। পরশু চালের বস্তাও চেয়ে বসতে পারে। তখন? তখন ঠেকাবে কিভাবে?'

'কিন্তু ওরা তো শুধু একমুঠো চালই নেয়। এর বেশি চায়নি আজ পর্যন্ত। শুনেছি ওটা দিয়ে গরিব ছাত্রদের সাহায্য করে।'

'বললেই হলো গরিব ছাত্রদের সাহায্য করে। এগুলো সবই ফন্দি। বুঝেছ? কাল সকালেই ওর বাবার কাছে নালিশ জানাতে হবে। এমন ছেলেকে শায়েস্তা করতেই হবে।'

গৃহকর্ত্রী বললেন, 'থাক। ওর বাবাকে জানিয়ে কাজ নেই। কখন কী...'

ধমকে উঠলেন গৃহকর্তা, 'তুমি চুপ করো। নালিশ জানাতেই হবে। এর একটা বিহিত করতেই হবে। চলো এবার শুয়ে পড়ি।'

'যদি আবার ইট মারে?'

এবার আতঙ্ক ঢুকে গেল গৃহকর্তার মনে। সত্যিই তো! যদি আবার কিছুক্ষণ পরে ইট মারে? না ঘুমিয়ে সারা রাত ঠায় বসে রইলেন বাড়ির কর্তা। সেই ভোর পর্যন্ত। কিন্তু আর কোনো ইট মারার শব্দ শুনতে পেলেন না।

২৩

পরদিন রাতে বাবা ডাক দিলেন, 'খোকা?'

বাবার ডাকটা যেন কেমন। খানিকটা ঘাবড়ে গেল খোকা। নিশ্চয়ই কেউ বাবার কাছে নালিশ করেছে। সেই লোকটাই হবে। ব্যাটা নচ্ছাড়—এক মুঠো চাল দেওয়ার বেলায় নেই, নালিশটা ঠিকই করে গেল।

এমনিতে বাবাকে ভয় পায় না খোকা। কিন্তু ওর কোনো অন্যায় হলে আর রেহাই নেই। দুরু দুরু বুকে বাবার সামনে হাজির হলো।

খোকাকে দেখেই বাবা জানতে চাইলেন, 'মানুষের বাড়িতে ইট মেরেছ খোকা?'

খোকা চুপ করে রইল। বাবা বুঝলেন, সত্যিই খোকা ইট মেরেছে।

আবার জানতে চাইলেন বাবা, 'কেন মেরেছ?'

তবু চুপ করে রইল খোকা। আবারও বললেন বাবা, 'কেন মেরেছ বলো? নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল। আমি জানি কারণ ছাড়া তুমি কিছু করো না। কারণটা আমাকে বলো, খোকা।'

বলল খোকা, 'এমনি এমনি মারি নাই আব্বা। এত কৃপণ হলে হয়? মাত্র একমুঠো চাল চাইতে গিয়েছিলাম। সেটা দিতেই এত আপত্তি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। একজন সামর্থ্যবান মুসলমান হয়ে আরেক মুসলমানকে সাহায্য করবে না, ভাবতেই পারি না। ওসব মুসলমানের রাতে শান্তিতে ঘুম হয় কেমন করে? তাদের শান্তিতে রাতে ঘুমানোর অধিকার নাই।'

'তাই বলে রাত-বিরাতে তুমি তাদের বাড়িতে ইট মারবে?'

'বেশ করেছি।'

'উঁহু। বেশ করোনি। ওই লোকটা কৃপণ বুঝলাম। কাউকে সাহায্য করে না। তাই বলে তুমিও তার মতো হয়ে যাবে? তুমি তো তার মতো নও খোকা? ও বাড়িতে না পাও, অন্য বাড়িতে যাও। কাজটা তুমি মোটেই ঠিক করোনি খোকা। তুমি নিজেই ভেবে দেখো, তুমি কি ঠিক কাজ করেছ?'

ভাবতে লাগল খোকা। সত্যিই ও কাজটা ঠিক করেনি। কিছুক্ষণ পর বলল, 'সত্যি আব্বা, কাজটা আমি ঠিক করি নাই।'

বাবা বললেন, 'এজন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।'

জানাল খোকা, 'অন্যায় যখন করেছি, তখন যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নেব।'

এক রবিবার। মুঠোচাল সংগ্রহে বেরিয়েছে খোকা। ইদানীং মানুষগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে। একমুঠো চাল দিতেও গড়িমসি করে। মানুষগুলোর ওপর বড্ড ত্যাক্ত-বিরক্ত খোকা আর ওর দলবল। দলের ছেলেরা তো ফিরে যেতে চেয়েছিল। একজন বলল, 'মুজিব ভাই, চলেন তো ফিরে যাই। কী হবে এসব করে। মানুষ কেবল ভুল বোঝে। আর যেভাবে তাকায়, লজ্জায় মরে যাই।'

খোকা বলল, 'ওসব গায়ে মাখবা না। মানুষ বিরক্ত হবেই। কিছু মানুষ আছে যারা সবকিছুতেই বিরক্ত হয়। তোমার কাজটা ভালো না খারাপ সেটা ভাবে না। বিরক্ত হওয়াই যেন ওদের কাজ। এসব গায়ে মাখলে হয় না।'

দলের আরেক সদস্য বলল, 'ভাবটা এমন করে, যেন আমরা ভিক্ষুক। বাড়ি বাড়ি যেন ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। ভালো লাগে না।'

খোকা বলল, 'ভালো না লাগলেও এখন করতে হবে। কাজটা করে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, এটা ভিক্ষে নয়। এটা হচ্ছে সবাই মিলে কিছু মানুষের জন্য কিছু করা। আরে, মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? মানুষের জন্যই তো, নাকি! মানুষের উপকারে যদি কিছু করতেই না পারি, তাহলে মানুষ হয়ে জন্ম নিলাম কেন। কেন মুসলমান হলাম, যদি আরেক মুসলিম ভাইয়ের উপকার করতে না পারি। অসহায় মুসলিমকে সাহায্য করা তো আমাদের সবার কর্তব্য।'

আরেক সদস্য বলল, 'উঁহ। ওদের এই কর্তব্যটাও তো আমরা করে দিচ্ছি। তবু এত ঝামেলা করে।'

খোকা বোঝাল, 'ওরা যদি এটা বুঝত, তবে তো আমাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুঠো চাল জোগাড় করতে হতো না। ওরাই বরং নিজেরা এসে আমাদের সাহায্য করে যেত।'

হঠাৎ এক সদস্য বলল, 'ওই তো একটা মুসলিম বাড়ি। ও বাড়ি থেকে একদিনও একমুঠো চাল আদায় করতে পারিনি। ও বাড়িতে আমি যাব না।'

আরেক সদস্য পিছিয়ে গেল, 'আমিও যাব না। ও বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হবে ভাবলেও ঘেন্না লাগে।'

খোকা দেখল, একে একে সবাই পিছিয়ে গেল। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেবল খোকা একা। কিন্তু থলে? থলে তো ওদের কাছে। খোকা এবার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দলের কাছে এলো। খোকাকে দেখে একজন বলল, 'কী মুজিব ভাই, আপনিও বুঝি সাহস হারিয়ে ফেললেন?'

খোকা বললেন, 'আরে ধ্যাৎ! আমাকে কখনো সাহস হারাতে দেখেছ? ওই জিনিসের কমতি আমার কোনো কালেই ছিল না। আর কখনো হবেও না ইনশাল্লাহ।'

আরেকজন বলল, 'তবে ফিরে আসলেন যে?'

খোকা বলল, 'মুষ্টি চালের থলেটা দাও। চাল দিলে নেব কিসে?'

এবার হাসিতে ফেটে পড়ল খোকার দলবল, 'উঁহ। চাল তো দিবেই না, উল্টো কিছু কথা শুনিয়ে দেবে। সেই কথা নেয়ার থলে তো আমাদের কাছে নেই।'

বলেই আবার হাসতে লাগল সবাই।

কিন্তু খোকা হাসল না। বরং অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'কথা শোনাবে কেন? তোমরা কিছু করেছ নাকি?'

এবার এক সদস্য আরেক সদস্যকে দেখিয়ে বলল, 'আমি করি নাই মুজিবভাই। ও করছে।'

জানতে চাইল খোকা, 'কী করেছ? আমার মতো ইট মেরেছ চালে?'

'হুঁ।'

'নাহ। কাজটা ঠিক করো নাই। আর কখনো করবে না। এজন্যই তো বলি, আব্বা আমাকে আবার শাস্তি দিলেন কেন? যতই বলি এ সপ্তাহে আমি কারো চালে ইট মারি নাই, তবু আব্বা বিশ্বাস করেন না। এখন বুঝলাম। মেরেছ তুমি, আর নালিশ গেছে আমার আব্বার কাছে। শাস্তি পেয়েছি আমি। আর কখনো করবে না। মনে থাকে যেন। এখন থলেটা দাও।'

'তবু যাবেন মুজিব ভাই?'

'কেন যাব না? আমি তো কোনো অন্যায় করি নাই।'

'সত্যিই আপনার সাহস আছে মুজিব ভাই।'

থলেটা নিয়ে এগিয়ে গেল খোকা। বাড়িটার সামনে যেতেই, হঠাৎ কে যেন ডাকল, 'অ্যাই খোকা?'

তাকাল খোকা। সেই বাড়িটা থেকে ডাক এসেছে। যে বাড়িতে খোকা ইট মেরেছিল। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গৃহকর্ত্রী।

খোকাকে তাকাতে দেখে আবারও ডাকলেন গৃহকর্ত্রী, 'অ্যাই খোকা, এদিকে এসো।'

বলে হাত দিয়েও ইশারায় কাছে ডাকলেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে খোকা। নালিশ জানানোর পর আর ওই বাড়িতে যায় না খোকা। ও বুঝে গিয়েছে, সবাই সহযোগিতা করতে পারে না। সবার সে মন নেই। সবার সে আত্মা নেই। খোকার মনে হয়েছে ওই বাড়িটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তাই এড়িয়ে যায়।

খোকার হাতে থলে। আজ খুব একটা চাল জোগাড় হয়নি। ওদিকে অসহায় ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জানে না সবার জন্য কতটুকু করতে পারবে। মানুষ যেরকম কৃপণ হয়ে যাচ্ছে, কতদিনই বা করতে পারবে। আজ কতগুলো বাড়িতে টুঁ মারতে হবে কে জানে।

বাড়ির সামনে যেতেই, খোকাকে দেখে এগিয়ে এলেন গৃহকর্ত্রী। বললেন, 'তোমাদের সমিতি কি এখনও আছে?'

'হুঁ।'

'সমিতির কাজকর্ম কেমন চলছে?'

'ভালো।'

'আমাদের বাড়িতে আর আসো না কেন খোকা?'

এ কথার জবাব দিল না খোকা।

গৃহকর্ত্রী বললেন, 'দেখি আজ কতটুকু চাল জোগাড় হয়েছে?'

বলে নিজেই থলের মুখটা মেলে ধরলেন। তারপর খোকা কিছু বোঝার আগেই আঁচলের তলা থেকে বড়সড় এক বাটি চাল বের করে ঢেলে দিলেন থলের মধ্যে।

অবাক হয়ে গেল খোকা। বলল, 'এটা কী করলেন খালাম্মা? উনি জানতে পারলে...'

'আরে বাদ দাও তো ওসব। শোনো, এরপর কিন্তু আমার বাড়ি থেকেও চাল নিয়ে যাবে। এই বলে দিলাম।'

বাড়িতে ইট মারার জন্য বেশ অনুতপ্ত হয় খোকা। বলে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন খালাম্মা।'

অবাক হয়ে গৃহকর্ত্রী জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'আপনাদের বাড়িতে ইট মেরেছি বলে। আসলে আমার খুব রাগ হয়েছিল।'

'থাক। তুমি ছেলেমানুষ। একটা দোষ করে ফেলেছ। কিন্তু তোমার উদ্যোগটা তো ভালো। চালিয়ে যাও খোকা। আমার দোয়া থাকল তোমার সঙ্গে।'

বলেই আর দাঁড়ালেন না গৃহকর্ত্রী। ঢুকে গেলেন ঘরের ভিতর। খোকা অবাক হয়ে গেল।

এবার তাকাল দূরে দাঁড়ানো দলের সদস্যদের দিকে। কিন্তু এ কী! সবাইকে ঝাপসা দেখাচ্ছে কেন? চশমার কাচ দুটো মনে হচ্ছে ঘোলা হয়ে গেছে। হুম। চশমার কাচ নয়, ওর চোখ দুটোই ঘোলা হয়ে উঠেছে নোনা পানিতে। চশমার ফাঁক দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গালের ওপর গড়িয়ে পড়লই। কোনোভাবেই আটকে রাখা গেল না।

২৪

খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস সেই ছোটবেলা থেকেই ছিল খোকার। বাবা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। খবরের কাগজে রাজনীতির খবর থাকত বেশি। কিন্তু খোকার তখন রাজনীতির খবরের প্রতি আগ্রহ ছিল খুবই কম। তখন খোকার আগ্রহ খেলাধুলায়। বিকেল হলে আর খোকাকে আটকে রাখা যেত না। স্কুল মাঠে

গিয়ে হাজির হতো। ঢ্যাং ঢ্যাঙে লম্বা খোকাকে যে কোনো দল পেতে চাইত। আর বৃষ্টির দিন হলে তো কথাই নেই। তখন বিকেল হওয়ার অপেক্ষা করে কে? বৃষ্টির দিনে ফুটবল খেলতে যা দারুণ লাগে! একটু দৌড়েই চিৎপটাং। কিংবা জোরে মারলেও বল অত দূরে যায় না। আটকে যায় পানিতে। এমন খেলার মজাই অন্য রকম। খেলার চেয়ে মজাটা বেশি। তাই বলে খোকা যে সিরিয়াস খেলোয়াড় ছিল না, তা কিন্তু নয়। ফুটবলের একনিষ্ঠ ভক্ত। যদিও স্কুলের ভলিবল আর হকি দলেও ওর নাম ছিল। হকি আর ভলিবল তো শীতকালের খেলা। শীতের সময় ভলিবলের কোর্ট কেটে তারপর চলত খেলা। হকিও খেলা হতো। তবে ফুটবলের মতো অত নয়। ফুটবলটা বেশ ভালো খেলে খোকা। স্কুল টিমে সুযোগও মিলেছে। ফুটবল মাঠেও খোকার কর্তৃত্ব। খোকা যা বলবে, তা-ই। এবং দলের সব খেলোয়াড় খোকার নির্দেশ মানত। মাঝে মাঝে দল নিয়ে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় যেত খেলতে। দল নিয়ে কখনো মধুমতী পেরিয়ে যেত চিতলমারী, কখনো মোল্লারহাট। খোকার ফুটবল দলটা তখন গোপালগঞ্জে বেশ আলোড়ন তুলেছিল।

একদিন। স্কুলের মাঠেই চলছিল ফুটবল ম্যাচ। মাঠের চারপাশে অনেক দর্শক। এমন ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় দর্শকের অভাব হয় না। কেউ ভালো খেললেই দর্শকরা হাত তালি দিয়ে উৎসাহ দেয়। আবার ঠিকমতো দলের খেলোয়াড়কে বলের যোগান দিতে না পারলে কিংবা গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল দিতে না পারলে ধুয়ো ধ্বনি দেয় দর্শকরা। আর খেলার পুরো সময় ধরে কিছু দর্শকের চিৎকার চেঁচামেচি তো আছেই।

তো সে ম্যাচে খোকা খেলছে। হঠাৎ চেনা কণ্ঠের চিৎকার! তাকাল খোকা। আরে! বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোকার খেলা দেখছেন আর উৎসাহ দিচ্ছেন গলা ফাটিয়ে।

এরপর অনেক বার ফুটবল মাঠে বাবাকে দেখেছে খোকা। অথচ আগে থেকে কখনো বাবা জানাতেন না যে, তিনি খোকার খেলা দেখতে আসবেন।

এসময়ই খোকার একটা দল তৈরি হয়। খোকার স্বভাবটাও এসময় বড্ড একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। কেউ কিছু বলে রেহাই পেত না। দলবল নিয়ে কিলবিলিয়ে ধরত খোকা। খোকার দলকে ভয় পেত না, এমন কেউ ছিল না পুরো গোপালগঞ্জে। ছোটরা তো সমীহ করতই, বড়রাও রয়েসয়ে চলত। প্রায় দিনই এ দলের সঙ্গে মারপিট ও দলের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলত। আর সবকিছুর নালিশ চলে যেত বাবার কাছে। খোকার নামে নালিশ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন বাবা। বাবার কাছে নালিশ গেলেই ভয়ে কাঁপত খোকা।

কিন্তু আগে কখনো বাবাকে এত ভয় পেত না। ইদানীং বড্ড ভয় পায়। বাবার ডাক শুনলেই খোকা বুঝতে পারে, আজ কেউ নালিশ করে গিয়েছে। আর ওর কপালে খারাপি আছে।

খুব ছোট্ট শহর গোপালগঞ্জ। শহরের এক মাথায় থাকত খোকারা। কিন্তু শহরের অন্য মাথায় গিয়ে কিছু করলেও ঠিক বাবার কাছে চলে যেত খবর। শহরের অন্য পাশে থাকতেন আবদুল হাকিম মিয়া। খোকা তাঁকে চাচা বলে ডাকে। বাবার সঙ্গে একই অফিসে চাকরি করেন। বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুও। খোকাকে যেখানেই দেখতেন, বাবার কাছে বলে দিতেন। কখনো কখনো নিজেই ধমক দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন খোকাকে। এমনও হয়েছে, বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ঠিকই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে খোকা। তারপর চলে গিয়েছে শহরের অন্য প্রান্তে। কিন্তু হাকিম চাচার চোখ এড়াতে পারেনি। চিলের মতো চোখ ছিল। দূর থেকে যেন ভালো দেখতে পান। আর খোকাকে দেখতে পেলেই হলো। ধমক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেনই। যদি খোকা তাঁকে দেখতে পেয়ে সরে যায়, তবু রেহাই নেই। বাবার কাছে নালিশ!

একদিন দলের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করছিল খোকা।

'ধ্যাৎ। এভাবে কি স্বাধীনভাবে থাকা যায়?' বড্ড ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল খোকা।

জানতে চাইল ফিরোজ, 'আবার কী হয়েছে রে খোকা?'

এই ফিরোজ হচ্ছে খোকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না। ফিরোজের বাবা গোপালগঞ্জের এমএলএ। মানে মেম্বার অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। ফিরোজের বাবার নাম খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ।

দলের একজন বুদ্ধি দিল, 'চল হাকিম চাচার চালে ইট মারি।'

মুখটা মলিন করে খোকা বলল, 'নাহ। উনি তো আর মুষ্ঠিচাল দিতে অস্বীকার করেন নাই। তাছাড়া আমি এখন ইটমারা বন্ধ করে দিয়েছি। আব্বার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আর কারো চালে ইট মারব না।'

'কিন্তু মুরুব্বীকে তো শায়েস্তা করতে হবে মুজিব ভাই। নাকি অন্যকোনো উপায় ভাবব?'

থামিয়ে দিল খোকা, 'কোনো উপায় ভাবার দরকার নাই। আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাকিম চাচা। তাঁর কোনো অনিষ্ট আমি করতে পারব না। কাউকে করতেও দিব না।'

'তাহলে আপনি হাকিম চাচার যন্ত্রণা নিয়েই থাকুন মুজিব ভাই। আমরা আর এর মধ্যে নাই।'

খোকাও জানিয়ে দিল তার চূড়ান্ত মত, 'না থাকলেই ভালো। আমিও খুশি হই।'

হাকিম চাচার এমন অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে গিয়েছে খোকা। তবু কোনোদিন অনিষ্ট করার কথা ভাবেনি।

মনটাই খারাপ হয়ে গেল খোকার। কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে হাঁটতে লাগল। পিছন থেকে দলের ছেলেরা ডাকতে লাগল, 'মুজিব ভাই, কই যান?'

জবাব দিল না খোকা।

'অ্যাই খোকা দাঁড়া।'

ফিরোজের গলা। খোকা দাঁড়াল। পিছন থেকে ছুটে এলো ফিরোজ। জড়িয়ে ধরল খোকাকে। জানতে চাইল, 'রাগ করেছিস?'

'নাহ।'

'তাহলে চলে যাচ্ছিস কেন?'

'ভালো লাগছে না।'

'কোথায় যাচ্ছিস শুনি?'

'জানি না।'

জবাব শুনে হেসে ফেলল ফিরোজ। বলল, 'বুঝেছি। তোর মন খারাপ। সত্যি মন খারাপ?'

খোকা কিছু বলল না। সত্যি ওর মনটা খুব খারাপ।

ফিরোজ বলল, 'কেন মন খারাপ জানিস?'

ফিস ফিস করে জবাব দিল খোকা, 'জানি না।'

আর কোনো কথা বলল না কেউ। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো নদীর পাড়ে। খোকা নদীর পাড়ে এলো অনেকদিন পর। আগে প্রতিদিন সকালে তো আসতই, কখনো কখনো বিকালেও। সঙ্গে থাকতেন হামিদ মাস্টার।

হামিদ মাস্টারের কথা মনে হতেই মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল খোকার। ধুপ করে এক জায়গায় বসে পড়ল। তাকিয়ে রইল নদীর দিকে। সূর্যটা ততক্ষণে পশ্চিমে অনেকখানি হেলে পড়েছে। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে। এই লাল থেকে একসময় হবে গোলাপি। তারপর টুপ করে ডুবে যাবে। তারপর অন্ধকার নেমে আসবে। হামিদ স্যার এখন অন্ধকার জীবন-যাপন করছেন।

২৫

মানুষটার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারবে, ভাবেনি খোকা। কখনোই ভাবেনি। কোন মানুষ?

খোকা এখন নবম শ্রেণিতে পড়ে। নবম শ্রেণি! কিন্তু গায়ে গতরে কত্ত বড় দেখায়। দেখাবেই তো। এমনিতেই ওর বয়সী আর সবার চেয়ে খোকা বেশ লম্বা। তার ওপর ওর সহপাঠী সবাই ওর চেয়ে বয়সে ছোট।

মায়ের খুব আফসোস। খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট হলো না। কেমন হ্যাংলা-পাতলা। খাবারের প্রতি মন নেই। এ বয়সের ছেলেপুলেরা কেমন হাপুস-হুপুস করে খায়। আর খোকা? খিদে পেলেও টের পায় না। সারা দিন কেবল খেলা আর খেলা। নাহ। লেখাপড়াও করে খোকা। এখন তো অনেক পড়া খোকার। স্কুল ছুটি হলেই বইখাতা রেখে মাঠে ছুট দেয়। কিন্তু খাওয়া-দাওয়াটা বাবা ঠিকমতো করো? সেটা খোকা এ কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও কান দিয়ে বের করে দেয়।

একদিন স্কুল থেকে খবর নিয়ে এলো খোকা।

'জানেন আম্মা, গোপালগঞ্জে কারা আসছেন?'

মা মুচকি হেসে বললেন, 'জানি। বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক আর শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ঠিক বলেছি?'

'হুম। আব্বার কাছ থেকে আগেই শুনেছেন, বুঝেছি। কিন্তু আরেকটা খবর আছে। সেটা তো জানেন না।'

'কী খবর?'

'হুঁ হু। সেটাই তো আসল খবর।'

'কী খবর বলো?'

'তাঁদের জন্য একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতে হবে। আর সেটা করতে হবে আমাকে।'

'তাই নাকি! বাহ। দারুণ খবর তো! আমার খোকা দেখছি অনেক বড় হয়ে গেছে।'

'বড় দেখেই তো আমাকে দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে।'

গোপালগঞ্জ শহরে তখন হইচই পড়ে গিয়েছে। একসঙ্গে একই দিনে দুজন মন্ত্রী আসছেন, এ কী কম কথা! গোপালগঞ্জের সবাই খুশি। সবাই উল্লসিত। কিন্তু ঝড় যাচ্ছে খোকার উপর দিয়ে।

আগত অতিথিদের সেবা দিতে স্বেচ্ছাসেবক দল বানাল খোকা। অমন স্বেচ্ছাসেবক দলের সঙ্গে সবাই থাকতে চায়। খোকা কিন্তু দলমত নির্বিশেষে সবাইকে দলে রেখেছে। কোনো স্বজনপ্রীতি কিংবা একচোখা নীতি করেনি। বন্ধু ফিরোজকে বলল, 'আমার দলটা কেমন হলো বন্ধু?'

ফিরোজ বলল, 'খুবই ভালো। এজন্যই তো তোকে সবাই এত ভালোবাসে। তুই দেখছি শত্রু-মিত্র বাছবিচার করিসনি। সবাইকে দলে রেখেছিস। এমন দল সবাই বানাতে পারবে না।'

কিন্তু এ কী! হঠাৎ স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে সরে পড়তে লাগল হিন্দু ছাত্ররা।

খুব অবাক হলো খোকা। হিন্দুদের সঙ্গে তো ওর কোনো রেষারেষি নেই। হাঙ্গামা নেই। বরং ওর বন্ধুদের মধ্যে হিন্দুই বেশি। তাহলে? ওদিকে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে জরুরি আলোচনা করতে হবে। এ সময় যদি দল থেকে সরে পড়ে, তবে কিভাবে সব সামাল দেবে খোকা? তবে কি কোনো অদৃশ্য শত্রু আছে এর পেছনে? যারা চায় না খোকা সফল হোক। নাকি অন্য কোনো ব্যাপার। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হয়!

এক হিন্দু বন্ধুকে পাকড়াও করল খোকা। জানতে চাইল, 'তুমি দল থেকে সটকে পড়লে কেন?'

বন্ধুটি বলল, 'কী করব মুজিব ভাই, কংগ্রেস থেকে যে আমাদের নিষেধ করেছে।'

'কী নিষেধ করেছে?'

'অনেককিছু নিষেধ করেছে।'

'কী কী শুনি?'

'স্বেচ্ছাসেবক দলে কাজ করা যাবে না।'

'আর?'

'সম্বর্ধনা যাতে ঠিকমতো না হয় সে চেষ্টা করতে হবে।'

'বলিস কি!' বড্ড অবাক হলো খোকা। জানতে চাইল, 'এতে কংগ্রেসের কী লাভ হবে শুনি?'

'জানি না ভাই। আমাদের যা করতে বলা হয়েছে আমরা সেটাই করছি।'

'আর কী কী বলা হয়েছে শুনি?'

'এগজিবিশনে যাতে দোকানপাট না বসতে পারে, সেই চেষ্টাও করতে বলা হয়েছে।'

এবার যেন খোকার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এগজিবিশনেও বাধা!

আরো অবাক হলো খোকা।

মলিন মুখে বলল, 'দেখ ভাই। সারা বছর তোমাদের সাথেই আমার বন্ধুত্ব, চলাফেরা, গানবাজনা করা, খেলাধুলা করা, ঘুরে বেড়ানো—সব। তাই না?'

বন্ধুটি নতমুখে জবাব দিল, 'জানি বন্ধু। এসব বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছো কেন?'

খোকা বলল, 'তোমাদের কাছে বন্ধুত্বের চেয়ে কংগ্রেস বড় হয়ে গেল? তার ওপর দেখো, এগজিবিশনে যেসব দোকান বসবে, তার শতকরা আশিটাই তোমাদের মানে হিন্দুদের। সেই তোমরা এ সময় এসে পিঠটান দিলে? এটার নামই কি বন্ধুত্ব?'

বন্ধু ফিরোজের বাবা খন্দকার শামসুদ্দীনের কাছে বিচার নিয়ে গেল খোকা। তিনি খোকার বাবারও বন্ধু। শামসুদ্দীন সাহেব বললেন, 'কী বলব বাবা, রাজনীতি এমনই। অনেক সময় খুব বেশি নোংরা ছড়ায়।'

জানতে চাইল খোকা, 'কিন্তু এমন হবার কারণটা কী চাচা?'

'কারণ তো ওই একটাই। হক সাহেব মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট বেঁধে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এতেই খেপে গিয়েছে কংগ্রেস। আর কংগ্রেস খেপিয়ে তুলেছে হিন্দুদের।'

'এখন উপায়?'

সাহস দিলেন ফিরোজের বাবা, 'উপায় তুমি নিজেই বের করে নিতে পারবে খোকা। তোমার প্রতি আমাদের সবার সে আস্থা আছে। তুমি কাজে নেমে যাও। সবকিছু তুমি ঠিকমতোই সামাল দিতে পারবে। আর আমাদের তরফ থেকে যতখানি সম্ভব আমরা সাহায্য করব তোমাকে।'

ভীষণ জেদ চেপে গেল খোকার। ভীষণ জেদ। খোকাকে কখনো এতটা জেদি হতে দেখেনি কেউ। না গোপালগঞ্জের কেউ, না টুঙ্গিপাড়ার কেউ। সম্বর্ধনা সফল করে খোকা দেখিয়ে দেবে, দুনিয়ায় কোনো মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। মন দিয়ে কাজ করলে এবং কাজের প্রতি বিশ্বাস থাকলে, ধৈর্য থাকলে, সে কাজে সফল হবেই হবে।

স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মীদের নিয়ে জরুরি সভা ডাকল খোকা। দেখা যাক কে কে আসে। খোকা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সম্বর্ধনা যত ছোটই হোক, সেটা হবেই। এগজিবিশনও হবে। তা সে যেমনই হোক। অনুষ্ঠান সফল করেই ছাড়বে। হঠাৎ খবর পেল খোকা, হক সাহেবের সঙ্গে আরো একজন মন্ত্রী আসছেন। মুকুন্দবিহারী মল্লিক। খোকার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

যাক, এবার নিশ্চয়ই হিন্দু ছাত্ররা আসবে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে সভা করতে গিয়ে হোঁচট খেল খোকা। ভেবেছিল ওর হিন্দু বন্ধুরা থাকবে। কই? সবার মুখের দিকে তাকাল খোকা। নেই। বেশিরভাগ বন্ধুই নেই। তবে কিছু নমশূদ্র হিন্দু ছাত্র এসেছিল। ভাগ্যিস তাও এসেছিল। মুকুন্দবিহারী মল্লিক না এলে তো ওরাও আসত না। কিছুটা তো রেহাই মিলল?

আরেকটা আশঙ্কা কাজ করল খোকার মনে। অনুষ্ঠান সফল করতে পারবে তো? শহরে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি। এখন আর ওদের বিশ্বাস নেই। যে কোনো সময় অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করতে পারে ওরা। যে কোনো সময় আক্রমণ করে বসতে পারে। আর ওরা আক্রমণ করে বসলে কিছুই করার নেই। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে বসে থাকলে চলবে না। একটা প্রস্তুতি রাখা দরকার। এবং প্রস্তুতিটা করেই রাখল খোকা। খবর পাঠাল গ্রামে। গ্রাম থেকে যথেষ্ট লোকজন এনে জড় করে ফেলল শহরে। এবার নিশ্চয়ই বেশি কিছু করার সাহস আর কেউ পাবে না। যদি সাহস দেখিয়েই ফেলে, তবে খোকাও পিছু হটবার পাত্র নয়। সাহসের কমতি নেই ওর। সমানে সমান না হলেও লড়াই চালিয়ে যাবে ও। কিন্তু বিনা যুদ্ধে ময়দান ছেড়ে যাবে না। কোনোভাবেই না।

ছোট্ট শহরটা কিন্তু তেতে উঠেছে এর মধ্যেই। খোকার হাতেই যে সবকিছু। সামান্য এদিক ওদিক হলেই বিপদ। অনুষ্ঠান সফল করতে না পারলে, সবাইকে কেমন করে মুখ দেখাবে খোকা?

কিন্তু মানুষটার সঙ্গে যে এখনও দেখা হলো না খোকার। তার আগেই বিস্তর ঝামেলায় জড়িয়ে গেল। তবে দেখা হবেই।

২৬

১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি। ঠিক সময়েই গোপালগঞ্জ এলেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সভা হলো। এগজিবিশন উদ্বোধন হলো। কোনো ঝামেলা হলো না। সভা শেষে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক গেলেন পাবলিক হল দেখতে। আর শ্রমমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী গেলেন মিশন স্কুল পরিদর্শনে।

মিশন স্কুলের ছাত্র হিসেবে খোকাই সম্বর্ধনা দিল শ্রমমন্ত্রীকে। স্কুল দেখা শেষ। ফিরে যাবেন মন্ত্রী। কিন্তু মন্ত্রীকে তো এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। স্কুলের কিছু সমস্যা আছে। সেগুলো মন্ত্রীকে জানানো দরকার। সুযোগ খুঁজতে

লাগল খোকা। মন্ত্রীর চারপাশে নানান মানুষ। মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিলাস বাবু, সরকারি কর্মকর্তা আর স্থানীয় গণ্যমান্য মানুষেরা ঘিরে রেখেছেন মন্ত্রীকে। এদের মধ্য থেকে মন্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগও হচ্ছে না। কেউ সুযোগই দিচ্ছে না। কী আর করা! নিজের মতো করেই সুযোগ বের করে নিল খোকা। হঠাৎ কয়েকজন ছাত্র নিয়ে মন্ত্রীর পথ আগলে দাঁড়াল।

ব্যাপার দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন প্রধান শিক্ষক। এ কী বেয়াদবি মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে! মন্ত্রীর সামনে থেকে দলটাকে সরিয়ে দিতে চাইলেন প্রধান শিক্ষক।

চোখ পাকিয়ে আর দাঁতে দাঁত চেপে বিলাস বাবু বললেন, 'এসব কী হচ্ছে মুজিব? পথ আগলে রেখেছ কেন? সরে যাও এখান থেকে।'

জবাব দিল খোকা, 'আগে মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে দিন, তারপর পথ ছাড়ব।'

'মাননীয় মন্ত্রী তোমার সঙ্গে কেন কথা বলবেন? কে তুমি? তুমি তো কেবল এ স্কুলের একজন শিক্ষার্থী। এখনো বলছি ভালোয় ভালোয় পথ ছেড়ে দাও।'

হইচই শুনে দু-চারজন সরকারি কর্মকর্তাও এগিয়ে এলেন, 'অ্যাই, কী হচ্ছে এখানে। জলদি পথ ছাড়ো।'

উঁহু। এত সহজে পথ ছাড়বে খোকা? প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তো আর চেঁচিয়ে কথা বলতে পারেনি। সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বলা যায়। চেঁচিয়ে বলল, 'মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত আমরা রাস্তা ছাড়ব না।'

'কিন্তু মন্ত্রী তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন কেন?'

'জরুরি দরকার আছে। মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না একবার। উনি যদি কথা বলতে রাজি না হন, তাহলে পথ ছেড়ে দেব।'

নাহ্! বড্ড বিচ্ছু ছেলেগুলো। বিশেষ করে দলের নেতা ওই ঢ্যাঙা ছেলেটা। সরকারি কর্মকর্তারা এবার হতাশ বদনে বিলাস বাবুর মুখের দিকে তাকালেন। বিলাস বাবু কিন্তু ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন, মুজিবকে সরানো তাঁর আয়ত্তের বাইরে। তিনি মানে মানে সরে গেলেন ওখান থেকে। ওদিকে চেঁচামেচির শব্দ চলে গিয়েছে সোহরাওয়ার্দীর কানে। মন্ত্রীর নজরে পড়ে গেছে খোকা। মন্ত্রী ওদের কথা শুনতে চাইলেন। এবার আর আটকে রাখতে পারলেন না কেউ। মন্ত্রীর কাছে যেতে দিলেন খোকাকে। মন্ত্রীর সামনে এগিয়ে গিয়ে খোকা বলল, 'মাননীয় মন্ত্রী, আপনার কাছে আমাদের একটা দাবি আছে।'

স্কুল ছাত্রের অমন সাহস দেখে মুগ্ধ হলেন সোহরাওয়ার্দী। মুচকি হেসে বললেন, 'বলো।'

খোকা বলল, 'হোস্টেলের ভাঙা ছাদ দিয়ে বর্ষাকালে পানি পড়ে। ছাত্রদের বই-খাতা ও বিছানাপত্র সব সময় ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। খুব কষ্ট হয় ছাত্রদের।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'আচ্ছা। বিষয়টা আমি দেখব।'

এবার সঙ্গে থাকা গণ্যমান্যরা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল খোকাকে। একজন বললেন, 'ব্যস। আর কী। সমস্যার তো সমাধান হয়েই গেল। এবার যাও।'

খোকা বলল, 'এখনো হয়নি।'

'হয়নি!' মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, 'দেখবে ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

খোকা আর কারো কথায় কান দিল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়। বলল, 'এক্ষুনি হোস্টেলের ছাদ মেরামতের ব্যবস্থা না করলে আমরা কেউ পথ ছাড়ব না। যা হবার হবে।'

পাশ থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আহা, কী যন্ত্রণা! মাননীয় মন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস নেই? ওদিকে যে লঞ্চের সময় হয়ে যাচ্ছে। সরে যাও, সরে যাও।'

পথ ছাড়ল না খোকা। ওদিকে কী যেন ভাবতে লাগলেন মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাউকে নির্দেশ দিলেন, 'আমার ঐচ্ছিক তহবিল থেকে এক্ষুনি ১২০০ টাকা মঞ্জুর করে দাও। এটা হোস্টেলের ছাদ মেরামতের জন্য।'

উপস্থিত সবাই বেশ অবাক হয়ে গেল। এভাবে পথ আটকে মন্ত্রীর কাছ থেকে দাবি আদায় করে নেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। খোকা বলেই পেরেছে।

দাবি তো আদায় হয়েছেই, মন্ত্রীর পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকা খোকাকে সরাতে এবার সবাই যেন উঠেপড়ে লাগল।

পাশের একজন সরকারি কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলেন মন্ত্রী, 'কে ছেলেটি? সবার খুব চেনাজানা মনে হয়?'

এক সরকারি কর্মকর্তা কবুল করলেন, 'জ্বী স্যার। ছেলেটা আমাদের পরিচিতই। টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশের ছেলে। খুবই খানদানি ফ্যামিলি স্যার। ছেলেটিও খুব সাহসী।'

এবার সবাইকে থামিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বললেন, 'ও আমার সঙ্গে থাকবে।'

হাঁটতে হাঁটতে ঘাটের দিকে যাচ্ছেন মন্ত্রী। পাশে খোকা। সোহরাওয়ার্দী জানতে চাইলেন, 'অ্যাই দ্যাখো, আমার কাছ থেকে দাবি আদায় করে নিয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমার নামটাই তো জানা হলো না খোকা। কী নাম তোমার?'

'শেখ মুজিবুর রহমান।'

'বাবার নাম?'

'শেখ লুৎফর রহমান।'

'বাড়ি?'

'টুঙ্গিপাড়া।'

'তোমার মতো সাহসী ছেলে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি খোকা। আচ্ছা, তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?'

'নাহ। মুসলিম লীগের কোনো প্রতিষ্ঠান এখানে নাই। মুসলিম ছাত্রলীগও নাই।'

এবার সবাইকে আরো অবাক করে দিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে নোটবুক বের করলেন মন্ত্রী। খোকার নাম ঠিকানা লিখে নিলেন নোটবুকে।

কিছুদিন পর আরো অবাক করা ব্যাপার ঘটল। মন্ত্রীর লেখা চিঠি এলো খোকার নামে।

খবরটা শুনে ছুটে এলো বন্ধু ফিরোজ। বলল, 'আরে খোকা, তুই তো পুরো গোপালগঞ্জে আলোড়ন তুলে দিয়েছিস। তোর কাছে মন্ত্রীর চিঠি এলো।'

বিষয়টা খোকার কাছে কিন্তু অত গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না। বলল, 'হুঁ।'

'তা কী লিখেছেন মন্ত্রী?'

জানাল খোকা, 'তেমন কিছু না। সফল অনুষ্ঠান করার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

চোখ দুটো কপালে তুলে দিয়ে ফিরোজ বলল, 'বলিস কি! মন্ত্রী তোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তুই তো হোমড়া-চোমড়া হয়ে উঠছিস।'

'ধ্যাৎ! কি যে বলিস না। মন্ত্রীর চিঠি পাওয়ার সঙ্গে হোমড়া-চোমড়া হওয়ার কী সম্পর্ক?'

'সত্যি বলছি। আজ পর্যন্ত শুনিনি কোনো মন্ত্রী এভাবে কাউকে চিঠি লিখতে পারেন। তুই দেখিয়ে দিয়েছিস। আসলে স্কুলের সমস্যাটা ওভাবে না বললে সমাধানও হতো না। তুই পেরেছিস।'

'ও কিছু না।'

'ওটাই অনেক কিছু রে খোকা। তা শুধুই ধন্যবাদ জানিয়েছেন? আর কিছু লিখেননি?'

'লিখেছেন তো!'

'আর কী লিখেছেন? শোনার জন্য অস্থির হয়ে আছি দোস্ত।'

'আর লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি।'

'বলিস কি!'

বলেই একটা লাফ দিয়ে উঠল ফিরোজ। জড়িয়ে ধরল খোকাকে। বলল, 'তুই আমাদের গর্ব খোকা। তোর জন্য আমারও খুব গর্ব হয়। তুই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ভাবতেও দারুণ লাগে। তা কলকাতা গেলে দেখা করবি না মন্ত্রীর সঙ্গে?'

'সেটা তো পরের কথা। আগে চিঠির জবাব দিয়ে নিই।'

'ওরেব্বাহ! দেখে নিস তুই একদিন অনেক বড় নেতা হবি। অনেক বড়।'

'কী করে বুঝলি?'

'সকাল দেখেই দিনটা বোঝা যায়। তোর মতো ব্যতিক্রম আর কাউকে আমি দেখিনি।'

এবার লজ্জা পেল খোকা। বলল, 'বাদ দে তো ওসব। চল নদীর পাড় থেকে হেঁটে আসি। কতদিন যাই না।'

লাফিয়ে উঠল ফিরোজ, 'চল চল। ওই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান সফল করতে যা ধকল গিয়েছে তোর ওপর দিয়ে। আমি হলে তো টানা সাতদিন বিশ্রাম নিতাম। কিন্তু তুই স্কুল কামাই না করে ক্লাস করছিস দিব্বি।'

দুই বন্ধু হাঁটতে চলে গেল নদীর পাড়ে। হাঁটতে হাঁটতেই খোকা ভেবে নিয়েছে, চিঠির জবাবে সোহরাওয়ার্দীকে কী লিখবে।

পরের দিনই চিঠির জবাব দিল খোকা। এরপর আবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চিঠি এলো খোকার নামে। আবার জবাব দিল খোকা।

তারপর এভাবে খোকা আর সোহরাওয়ার্দীর চিঠি বিনিময় চলতে লাগল। অনেকবার। মাঝে মাঝে জবাবের আশায় নয়, নিজে থেকেই সোহরাওয়ার্দীকে চিঠি লিখত খোকা। খোকার চিঠি পেলে কিন্তু খুশিই হতেন সোহরাওয়ার্দী। একসময় এই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকেই নতুন এক জীবনের দীক্ষা পেল খোকা। সে জীবনের নাম সংগ্রাম। সোহরাওয়ার্দী হয়ে উঠলেন খোকার রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু। আর দুজনের সম্পর্কটা এতই মধুর ছিল যে, খোকাকে তখন থেকেই নাতি বলে ডাকতে শুরু করেছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

২৭

ফুটবল খেলে কেবল বাড়িতে এসেছে খোকা। ১৯৩৮ সালের মার্চ বা এপ্রিলের কোনো এক সন্ধ্যা। সেদিন ছিল রবিবার। এর মধ্যেই বাড়ির দরজায় জোরে জোরে কড়া নড়ল। ঠক, ঠক, ঠক।

বাড়ির ভিতর থেকে হাঁক দিল খোকা, 'কে?'

খোকার গলা চিনতে পেরে জবাব এলো বাইরে থেকে, 'খোকা আমি বাসু মিয়া মোক্তার। দরজা খোলো।'

এই বাসু মিয়া মোক্তারই হচ্ছেন খন্দকার শামসুল হক। খোকা চেনে। এলাকার গণ্যমান্য মানুষ। খোকা দরজা খুলল। খোকাকে টেনে বাড়ির দরজা থেকে সামান্য পাশে সরিয়ে নিয়ে বাসু মিয়া বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে খোকা?'

বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিলেন বাসু মিয়া। নিশ্চয়ই ছুটতে ছুটতে এসেছেন। তাই হাঁপিয়ে গিয়েছেন। জানতে চাইল খোকা, 'কী হয়েছে?'

'মালেককে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।'

অবাক হলো খোকা। মালেককে ধরে নিয়ে গেছে! মালেক মানে আবদুল মালেক। খোকার সহপাঠী। আবার ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফিরোজেরও আত্মীয়।

আবার জানতে চাইল খোকা, 'কারা ধরে নিয়ে গেছে? কোথায় নিয়ে গেছে?'

'হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে নিয়ে গেছে। বেশ মারপিটও করেছে বেচারাকে।'

এই হিন্দু মহাসভা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন। কয়েকদিন ধরেই শহরে হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনা চলছিল। এমনিতেই শহরে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি। গোপালগঞ্জের আশপাশেও হিন্দু গ্রাম। কোনো উছিলা পেলেই হলো, ঘটনার বাছবিচার না করে সুযোগ পেলেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায় হিন্দুরা। সংখ্যায় বেশি হওয়ার সুযোগ নিচ্ছে ওরা।

বাসু মিয়া এবার খোকার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'যদি পারো একবার যাও। তোমার সঙ্গে তো ওদের খাতির আছে। তোমার কথা ওরা শুনবে। মালেককে ছাড়িয়ে নিয়ে আসো। তুমিই পারবে ওকে ছাড়িয়ে আনতে।'

আর দেরি করল না খোকা। কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে নিয়ে চলে গেল সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে।

সুরেনের বাড়িতে অনেক লোকজন। এত লোক দেখে বেশ অবাক হলো খোকা। আর খোকাকে দেখেই খেপে উঠল সুরেনের লোকজন। রমাপদ দত্ত নামের একজন তো তুমুল গালিগালাজ করল। প্রতিবাদ জানিয়ে খোকা বলল, 'দেখুন, গালিগালাজ করবেন না। আমার বন্ধুকে ধরে এনে মেরেছেন, এখন ওকে ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দিন।'

হুংকার দিয়ে উঠল একজন, 'না ছাড়লে কী করবে? ক্ষমতা থাকলে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও।'

নাহ। এভাবে হবে না। বুঝে গেল খোকা। ওই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বড্ড খেপে আছে খোকার ওপর। ওরা চেয়েছিল মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা যেন সফল না হয়। এজন্য ওরা যা যা করার দরকার, সবটুকুই করেছে। কিন্তু ওদের কূটকৌশল কাজে লাগেনি খোকার কারণে। খোকার ওপর রাগ তো ওদের হবেই। সেই রাগটা এতদিন পুষে রেখেছিল। এখন সুযোগ পেয়ে রাগ ঝাড়ছে।

দলের বাকি ছেলেদের খবর পাঠাল খোকা। ওদিকে দলবল নিয়ে খোকা আসতেই থানায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল রমাপদ। এর মধ্যেই তিনজন পুলিশও এসে হাজির হয়ে গিয়েছে।

খোকাও হুংকার দিয়ে উঠল, 'ভালোয় ভালোয় না ছাড়লে কেড়ে নিয়ে যাব।'

ওরাও কম যায় না। ফিরতি হুংকার দিয়ে বলল, 'পারলে নিয়ে যাও।'

ততক্ষণে খোকার দলের আরো অনেকেই এসে হাজির। এসেছেন খোকার এক মামা—শেখ সিরাজুল হক। হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেন তিনি। সিরাজুল হক শুধু খোকার মামাই নন, সম্পর্কে চাচাও হন। তিনি খোকার মা ও বাবা দুজনারই চাচাতো ভাই। ওদিকে নারায়ণগঞ্জে খোকার আরেক মামা ব্যবসা করেন। শেখ জাফর সাদেক। ঘটনার সময় তিনি গোপালগঞ্জেই ছিলেন। তিনিও খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। আর খোকার দলবল তো আছেই। দলে ভারী হওয়া মাত্রই জোরাজুরি করতে লাগল খোকা। লাঠিসোটা নিয়ে মারামারি শুরু হলো দুপক্ষে। তুমুল মারপিট।

মারধর করে মালেককে একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছিল সুরেনের লোকজন। দলবল নিয়ে খোকা সেই ঘরের দরজা ভেঙে ফেলল। উদ্ধার করল মালেককে। মালেককে উদ্ধার করে আর দেরি করল না। ফিরে এলো সবাই।

তবে কি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল? বেশ উত্তেজনা শহরে। অন্য কেউ হলে হয়তো সব হিন্দুরা মিলে ততক্ষণে আক্রমণ করে বসত। খোকাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। খোকার বাবাকে খবর দেয়া দরকার। কেমন ছেলেরে বাবা! মারপিট পর্যন্ত করে ফেলল দলবল নিয়ে! তা-ও আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু এলাকায়! কিন্তু কোথায় খোকার বাবা?

সেই রবিবারে খোকার বাবা তো গোপালগঞ্জ নেই। আগেরদিন মানে শনিবারেই টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে গেছেন। আসবেন আগামীকাল মানে সোমবার সকালে। গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়ায় খোকাদের বাড়ির দূরত্ব চৌদ্দ মাইল। খোকাদের নিজের নৌকা ছিল। সেই নৌকায় করেই যাওয়া-আসা করেন বাবা। যেহেতু খোকার বাবা নেই, কাজেই হিন্দু নেতারা নালিশ জানানোর মতো আর কাউকে পেল না। নাকি সাহস পেল না? কে জানে। তাই বলে এভাবে খোকাকে ছেড়ে দেয়া যায় না। বড্ড বাড় বেড়েছে শেখের ছেলের। আর বাড়তে দেয়া যায় না।

রাতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসলেন হিন্দু নেতারা। সঙ্গে ছিল সরকারি হিন্দু কর্মকর্তারা। মামলা করা দরকার খোকার বিরুদ্ধে। সে রাতেই থানায় বসে হিন্দু নেতারা এজাহার ঠিক করে দিলেন। এজাহারে হুকুমের আসামি করা হলো খন্দকার শামসুল হক মোক্তার সাহেবকে। আর খোকার নামে মামলা হলো খুনের চেষ্টা করার জন্য। মানে এটেম্পট টু মার্ডার! সঙ্গে আছে লুটপাট। এমনকি শান্তিপূর্ণ ছোট্ট শহরে শান্তি বিনষ্ট করার জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগানোর মামলাও করা হলো খোকার বিরুদ্ধে।

পরদিন ভোরে আরো কয়েকজনের নামে এজাহার দেয়া হয়। মামা মোক্তার সাহেব, খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ এমএলএ সাহেবের মুহুরি জহুর শেখ, খোকার বাড়ির কাছের বিশেষ বন্ধু শেখ নুরুল হক ওরফে মানিক মিয়া, সৈয়দ আলী খন্দকার, খোকার সহপাঠী আবদুল মালেক ও অনেক ছাত্রের নাম দেয়া হয় এজাহারে। এলাকার যত মান্যগণ্য মুসলমান আছে, তাদের কারো ছেলের নাম বাদ রাখেনি। সকাল নটার মধ্যে খবর পেয়ে গেল খোকা-মামাসহ বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে ফেলেছে। কিন্তু খোকাদের বাড়ি আসার সাহস পাচ্ছিল না পুলিশ। আসলে পুলিশও খোকাকে গ্রেফতার করতে চাইছিল না। ওদের ইচ্ছে খোকাকে যাতে গ্রেফতার করতে না হয়। এজন্য সময় নষ্ট করে বাড়ি থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছিল খোকাকে।

সকাল দশটার দিকে টাউন হলের মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে আলাপ করছিল থানার দারোগা। আর টাউন হলের পাশেই খোকাদের বাড়ি। দারোগাবাবু

কথা বলছিলেন বেশ উঁচু গলায়। নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিলেন। ভাবটা এমন, বাড়ি থেকে পালাও খোকা। বাড়ি থেকে পালাও। আমি কিন্তু তোমাদের বাড়ি আসছি। তার আগেই পালাও তুমি। যাতে তোমাকে বাড়িতে খুঁজতে এসে পাওয়া না যায়।

এতে দারোগাবাবুর সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

ঘটনা কিন্তু খোকাসহ বাড়ির সবাই বুঝে গিয়েছে। খোকার এক ফুফাতো ভাই থাকত বাড়িতে। বাড়ি মাদারীপুর হলেও খোকাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত। সে ফুফাতো ভাই বলল, 'মিয়া ভাই, এখনও বাড়িতে বসে আছো কেন?'

খোকা বলল, 'তাহলে কী করব?'

'পালিয়ে যাও।'

'না। আমি পালাব না।'

'তাহলে অন্তত পাশের বাড়িতে সরে যাও।'

'আমি তা-ও সরব না। আমি আমার বাড়িতেই থাকব। আসুক পুলিশ।'

'পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে কি ভালো হবে?'

'আমি পালিয়ে গেলেও কি ভালো হবে? লোকে বলবে আমি ভয় পেয়েছি। আমি তো ভয় পাইনি। একটুও ভয় পাইনি। আর ভয় পাবই বা কেন? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি? করিনি। কাজেই আমি পালাব না।'

নাহ। খুব হতাশ হলো ফুফাতো ভাই। বলল, 'মিয়া ভাই, তুমি আসলেই খুব একগুঁয়ে। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

২৮

খানিকপরেই বাবা এলেন বাড়িতে। বাবার পিছন পিছন দারোগাবাবুও ঢুকলেন।

বসার ঘরে আলাপ করছেন দুজন। বাবার পাশে বসে সব কাহিনি শোনালেন দারোগাবাবু। তারপর পকেট থেকে বের করলেন গ্রেফতারি পরোয়ানা। বাবাকে দেখালেন।

দারোগাবাবু ভেবেছিলেন বাবা হয়তো ছেলের হয়ে সুপারিশ করবেন। কিংবা কিভাবে ছেলেকে বাঁচানো যায়, সে ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ

করবেন। কিন্তু গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখানো মাত্রই বাবা আর কিছুই ভাবলেন না। বললেন, 'নিয়ে যান।'

'অ্যাঁ!'

দারোগাবাবুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল। চোখ দুটো উঠে গেল কপালে। কোনো রকমে বললেন, 'মানে?'

আগের মতো নির্বিকার ভঙ্গিতে বাবা বললেন, 'বলেছি তো নিয়ে যান।'

এবার বিশাল এক ঢোক গিললেন দারোগাবাবু। যেন বাবার কথা নয়, বিশাল এক মাছের কাঁটা বিঁধেছে দারোগাবাবুর গলায়। কাঁটাটা বড্ড যন্ত্রণাদায়ক। না পারছেন গিলতে, না পারছেন উগরে দিতে। অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকালেন দারোগাবাবু। আহা, এ সময় যদি কেউ তাকে বুদ্ধি দিতে পারত! যদি কেউ জানাতে পারত তিনি এখন কী করবেন? ঘামতে শুরু করল দারোগাবাবুর দশাসই শরীরখানা। এখন? এখন কী করবেন তিনি?

বেশ কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। আসলে বুদ্ধি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন দারোগাবাবু। অনেকগুলো উপায় উল্টে-পাল্টে যাচাই বাছাই করে ফেললেন। গলা খাকারি দিলেন। তারপর কোনো রকমে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'ও না হয় খেয়ে দেয়ে আসুক। না খেয়ে থানায় যাবে, কেমন দেখায়? আমি একজন সিপাহি রেখে যাচ্ছি। এখন তো সোয়া দশটা বাজে, এগারোটার মধ্যে থানায় এলেই চলবে। দেরি হলে আবার জামিন পেতে অসুবিধা হবে।'

বলেই আর অপেক্ষা করলেন না। জোরে জোরে পা চালিয়ে বেরিয়ে এলেন খোকাদের বাড়ি থেকে। আর খোকাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দারোগাবাবুর মনে হলো, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। আহ্! বিশাল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন থানার দিকে। বাকি অভিযুক্তদের খবর নিতে হবে। কারণ ঘটনাটা মোটেই সাধারণ নয়। গোপালগঞ্জে এমন আলোড়ন তোলা ঘটনা গত কয়েক বছরে ঘটেনি।

এবার খোকাকে ডাক দিলেন বাবা। খোকা সামনে এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। কঠিন গলায় কিন্তু আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন বাবা, 'মারামারি করেছ?'

বাবার এই রূপটা আগে কখনো দেখেনি খোকা। খোকার মনে পড়ল, সেই ছোট্টবেলায় বাবার গলা ধরে রাতে ঘুমাত। বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। গল্প শোনাতেন। বাবার কাছেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি শুরু হয় ওর। বাবা কত স্নেহভরা কণ্ঠে ওকে পড়াতেন। দুষ্টুমি করলে সবসময় নিষেধ করতেন না। অনেক সময় মনে হতো বাবা বুঝি ওর দুষ্টুমিতে মজা পাচ্ছেন। বাবার পিঠে করে কতদিন বিছানা থেকে নেমেছে। বাবার কাঁধে চড়ে কতদিন

মেলা থেকে ফিরেছে। কতদিন কত মন খারাপের সময় বাবা যখন ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, খোকা, তোমার কি মন খারাপ? আর কী অবাক! সঙ্গে সঙ্গে খোকার খারাপ মনটা কোথায় যে হারিয়ে যেত? ফুরফুরে একটা মন এসে দখল করত সে জায়গা। বাবার হাত ধরে গোপালগঞ্জ শহরে প্রথম এসেছিল। কিছুদিন বাবাই তো ওকে যত্ন-আত্তি করেছেন। ওর খবর নিয়েছেন ঠিকমতো রাতে ঘুম হয়েছে কি না। খিদে পেয়েছে কি না। কতদিন অফিস থেকে ফেরার সময় ওর প্রিয় খাবারগুলো এনে হাজির করেছেন সামনে। প্রিয় খাবার দেখে খোকার মুখটা তখন খুশিতে ভরে উঠেছিল। খোকার খুশি মুখ দেখে বাবার বুকটা ভরে যেত। বাবার চোখের দিকে তাকালেই খোকা তখন টের পেত—বাবা কী পরিমাণ খুশি হয়েছেন। মনে আছে, অসহায় অবস্থায় যখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকত খোকা তখন তো বাবাই ওর দেখা শোনা করেছেন। ওকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতেন। যে কোনো দরকারে বাবা ওর কাছে কাছেই থাকতেন। সবসময়। দরকারের সময় বাবাকে কাছে পায়নি, এমন কখনো হয়নি।

কিন্তু আজ! আজ কেন বাবার চোখের দিকে তাকাতেও সাহস হচ্ছে না খোকার? সেই বাবা আর এই বাবা কি এক বাবা? নাকি খোকারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবারাও বদলে যেতে থাকেন। নাকি বাবারাই ঠিক থাকেন, শুধু খোকারা বদলে যায়? খোকা যেন আর কিছু ভাবতে পারছিল না। কেবল বাবার সঙ্গে সেই দিনগুলোর কথাই ওর মনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে খোকার জবাবের অপেক্ষা করলেন বাবা। কিন্তু খোকা চুপ। বাবার দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না। সাহস পাচ্ছে না। বাবাকে বড্ড ভয় পায় খোকা এখন। খুব ভয় পায়।

সেই তখন থেকেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। খোকার দিকে একবার তাকিয়ে বাবাও আর কিছু বললেন না। বাবা বুঝে গিয়েছেন খোকা মারামারি করেছে। তাঁর সামনে জবাব দেয়ার সাহস পাচ্ছে না, তাই চুপ করে আছে। তিনি খেয়াল করেছেন, খোকা তাঁকে ভয় পায়। কিন্তু খোকা মারামারি কেন করে? মারামারি করার অভ্যাসটা ও কোথা থেকে পেল? খোকার কোনো কাজে তো তিনি বাধা দেন না। তবে হ্যাঁ। সে কাজটা যদি অন্যায় না হয়। তাই বলে মারামারি? গোপালগঞ্জে তাঁর কত সুনাম! শেখবাড়ির কত নামডাক। মারামারি করার আগে এগুলো একবারও ভাবল না খোকা? লজ্জায় যে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। এখানে খোকার নামে অভিযোগের শেষ নেই। প্রায় প্রতিদিনই এই অভিযোগ, সেই অভিযোগ। যদিও সব অভিযোগ নিয়ে

তিনি মাথা ঘামান না। জানেন, এ সময়টাই খোকার দুরন্তপনার বয়স। তাই বলে মারামারি? গোপালগঞ্জের সব মানুষ জানে খোকা মারামারি করেছে। মানুষের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। যদিও তাঁর এই বিশ্বাস অন্তত আছে, খোকা কোনো অন্যায় করতে পারে না। অন্যায় সহ্যও করতে পারে না। অন্যায় দেখলেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়। তবু যাই হোক, তাই বলে মারামারি করবে? দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে মারামারি করবে? অন্যায়টা কার, কেউ তো আর এখন সেটা দেখবে না। সবাই কেবল জানবে খোকা মারামারি করেছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। নিজের মাথাটাও নিচু করে বসে রইলেন বাবা।

বাবাকে ও অবস্থায় বসে থাকতে দেখে খোকারও কি খারাপ লাগেনি? লেগেছে। কোন ছেলেটা ইচ্ছে করে বাবার মাথা হেঁট করাতে চায়? কিন্তু খোকার তো আর কিছুই করার ছিল না। বাবাও তো কিছু জানতে চাইলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন ও মারামারি করেছে কি না। এটুকু জানলেই তো সবকিছু জানা হয়ে যায় না। কেন বাবা ওর কাছ থেকে সবটুকু জানতে চাইলেন না? ও তো মারামারি করতে চায়নি। করতে বাধ্য হয়েছে।

খুব দ্রুত খাওয়া শেষ করল খোকা। এসময় কি গলা দিয়ে খাবার নামে? তবু কোনো রকমে কিছু খাবার গিলে থানায় চলে এলো। সঙ্গে তো একজন সিপাহি ছিলই। থানায় এসে দেখা হয়ে গেল মামা, মানিকসহ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। সবাইকে আগেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খোকা গিয়ে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে কোর্টে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এমন অভিযুক্তদের হাতকড়া পরানোর নিয়ম। কিন্তু খোকাদের কাউকে হাতকড়া পরানো হয়নি। তবে সামনে-পিছনে পুলিশ প্রহরা ছিল।

কোর্টে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট হাজতের ছোট কামরায় বন্ধ করে রাখা হলো সবাইকে। কোর্ট দারোগাও হিন্দু। তাই ভাবলেন চটজলদি খোকার দলবল হাজতে পুরে রাখাই ভালো। নইলে আবার যদি মারামারি বাধায়। কোর্ট দারোগার ঘরটাও হাজতঘরের পাশে। খোকার দিকে হিংস্রভাবে তাকাচ্ছিলেন দারোগাবাবু। একসময় বলেই ফেললেন, 'মজিবর খুব ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিল রমাপদকে। এমন ভয়ানক ছেলেকে কিছুতেই জামিন দেয়া ঠিক হবে না।'

কথাটা শুনেই ভীষণ খেপে গেল খোকা। না জেনে কেউ অন্যায় কথা বললে কার সহ্য হয়? সবাই যদিও প্রতিবাদ করে না। তবে খোকা করল। চেঁচিয়ে বলল, 'দেখুন, বাজে কথা বলবেন না। বাজে কথা বললে কিন্তু ভালো হবে না।'

দারোগাবাবুর সামনে অনেকেই বসেছিলেন। এবার তাদের দিকে ফিরে দারোগাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'দেখেছেন! আপনারা তো নিজের কানেই শুনেছেন, এই ছেলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কত্ত বড় সাহস! কোর্ট হাজতে থেকে আবার কোর্টের দারোগাকে হুমকি দিচ্ছে!'

ওখানে যারা ছিলেন, সবাই বললেন, 'অ্যাই খোকা, চুপ করো তো!'

কিন্তু খানিক পরে এ কি শুনছে খোকা! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। খোকার নামে যে এজাহার করা হয়েছে, ওখানে বলা হয়েছে খোকা নাকি রমাপদকে মারার জন্য ছোরা মেরেছিল। ছোরার আঘাতে রমাপদর অবস্থা খুবই খারাপ। হাসপাতালে ভর্তি।

শূন্য দৃষ্টিতে কোর্ট হাজতের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল খোকা। আহ! যদি আকাশ দেখা যেত! কিন্তু এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে এজাহার ওরা দায়ের করল কিভাবে? এতটা নির্লজ্জ মিথ্যা বানাতে ওদের একটু শরীর কাঁপল না? ওদের বিবেক বাধা দিল না? আসল ঘটনা মনে করতে লাগল খোকা। কখনোই ছোরা নিয়ে খোকা ঘোরাঘুরি করে না। ওর হাতে তখন ছিল বাঁশ। ও তো শুধু বন্ধুকে ছাড়াতেই গিয়েছিল সুরেনের বাড়িতে। রমাপদটা অবশ্য বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল। বার বার তেড়ে আসছিল ওর দিকে। ওকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করল। তাতেও রমাপদর রাগ মিটল না। হাতে লাঠি নিয়ে তেড়ে এলো ওর দিকে। নাহ। আর তো চুপ করে থাকা যায় না। খোকাও লাঠি নিয়ে তেড়ে গেল। রমাপদ ওর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করতে চেয়েছিল কয়েকবার। খোকা নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। আর সুযোগ পেয়ে রমাপদর মাথায় ও আঘাত করল লাঠি দিয়ে। রমাপদ নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। মাথা ফেটে যায় রমাপদর। আর সেটাকেই কি না কাল্পনিক কাহিনি বানিয়ে ফেলল!

খোকাদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ে নামলেন মুসলমান উকিল মোক্তার সাহেবরা। ওদের জামিনের আবেদন জানানো হলো। একমাত্র মোক্তার সাহেবকে জামিন দেয়া হলো। তা-ও টাউন জামিন। মানে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবেন না মোক্তার সাহেব। কোর্টের পরবর্তী নির্দেশ পেলে তবে শহরের বাইরে যেতে পারবেন। বাকিদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হলো।

খোকার মামা আফসোস করে বললেন, 'আমাদের কেন জামিন দিল না বুঝতে পেরেছ খোকা? কারণটা খুব সোজা। এসডিওবাবু হিন্দু বলেই আজ আমাদের জামিন হলো না। কিন্তু এটা জামিনযোগ্য অপরাধ ছিল।'

সত্যিই ভয়ানক অন্যায় করা হচ্ছিল খোকাদের প্রতি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জেলহাজতে পাঠানোর হুকুম পেয়ে কোর্ট দারোগার মুখের হাসি আরো চওড়া হয়ে গেল। মনে হলো যেন বিশ্বজয় করে ফেলেছেন। খোকাদের হাতকড়া পরানোর নির্দেশ দিয়ে বসলেন তিনি। সবাই সে আদেশ মেনে নিল। কিন্তু রুখে দাঁড়াল খোকা। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি হাতকড়া পরব না। দেখি কে আমায় হাতকড়া পরায়?'

সবাই বোঝাল, 'দ্যাখো খোকা, এখানে কোর্ট যা বলবে সেটাই করতে হবে। নইলে বিপদ আরো বাড়বে।'

'কিন্তু...'

'না। আর কোনো কিন্তু নয় খোকা। এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো হাতকড়া পরাতে দাও।'

জেলখানায় এলো সবাই। সাবজেল। একটা মাত্র ঘর। একপাশে মেয়েদের থাকার জায়গা। কোনো মেয়ে আসামি না থাকায় মেয়েদের ওয়ার্ডে রাখা হলো খোকাকে। তবে একটা ভালো খবর ছিল। বাড়ি থেকে বিছানা, কাপড় আর খাবার পাঠানোর অনুমতি মিলল।

শেষ পর্যন্ত সাতদিন জেলখানায় কাটিয়েছে খোকা। জামিন মিলেছে সাতদিন পর। তা-ও শুধু খোকার। দশ দিনের মধ্যে বাকিদের জামিন হয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে খোকার প্রথম গ্রেফতার। প্রথম জেলখাটা।

কিন্তু জামিন পাওয়ার পরও উত্তেজনা কমল না। আগের মতোই উত্তপ্ত কড়াই হয়ে রইল গোপালগঞ্জ। মুসলমানসহ অনেকেই খোকার ওপর এমন অন্যায় আচরণ মেনে নিতে পারেনি। তার ওপর মিথ্যে মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে সবাইকে। যে কোনো সময় আবারও দাঙ্গা লেগে যেতে পারে। চটজলদি টেলিগ্রাম করা হলো শেরে বাংলা ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে। জরুরি খবর জানিয়ে লোকও পাঠিয়ে দেয়া হলো কলকাতায়। কবে যে আবার শান্ত হবে ছোট্ট শহরটা!

বাবার সঙ্গে হিন্দু উকিলদের ভালো বন্ধুত্ব ছিল। সবাই বাবাকে সম্মান আর যথেষ্ট সমীহ করতেন। হিন্দু উকিলদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন বাবা। সকাল বিকাল এ নিয়ে বৈঠক। প্রায় প্রতিদিনই। নানাজনের নানান মন্তব্য। একটা সমাধানে আসতে চাইছেন কেউ কেউ। কেউ কেউ আবার মামলা চালানোর পক্ষে রায় দিল। আবার অনেকেই এই অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার জন্য ইন্ধন যোগাতে লাগল। তবে শেষ পর্যন্ত একটা সমাধানে পৌঁছতে পেরেছে দুপক্ষই। বিস্তর আলোচনার পর ঠিক

হলো, সুরেন ব্যানার্জিরা আর মামলা চালাবে না। তবে ওদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পনেরশো টাকা।

টাকার অঙ্ক শুনে অনেকেই ভিরমি খেয়েছে। কিন্তু কী আর করা! শহরে শান্তি বজায় রাখা নিয়ে কথা। সবাই মিলে টাকা দিল। তবে খোকার বাবাকেই বেশি দিতে হয়েছে।

২৯

১৯৩৯ সালে কলকাতা বেড়াতে গেল খোকা।

আবার কলকাতা। এবার অন্য চোখে কলকাতা দেখতে থাকে খোকা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা হলো। শহীদ সাহেব তো খোকাকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত। শহীদ সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন আবদুল ওয়াসেক সাহেবের সঙ্গে। আবদুল ওয়াসেক তখন ছাত্রদের নেতা। তাঁকে গোপালগঞ্জে আসার নিমন্ত্রণ করল খোকা।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে খোকা বলল, 'গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করব। সঙ্গে মুসলিম লীগও গঠন করতে চাই।'

শহীদ সাহেব খুব খুশি হলেন। বললেন, 'তোমার মতো উদ্যমী থাকলে দলের জন্য ভালো হবে। এ এলাকার মুসলমানদের জন্য কিছু তো করতেই হবে। এমনিতেই মুসলমানরা সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে। রাজনীতি থেকেও। ঠিক আছে। তুমি গোপালগঞ্জ গিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করো। কী করতে চাও জানাও। আমার আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে থাকবে সবসময়।'

গোপালগঞ্জে ফিরে এলো খোকা। এর মধ্যেই গোপালগঞ্জের এমএলএ খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন। ছাত্রলীগের সভাপতি হলেন তিনি। আর খোকা হলো সাধারণ সম্পাদক। সঙ্গে মুসলিম লীগও গঠন করা হলো। মুসলিম লীগের সম্পাদক হলেন একজন মোক্তার সাহেব। তবে কাজ যা করার খোকাই করত। মুসলিম লীগের একটা ডিফেন্স কমিটিও গঠন করা হয়। ওখানে আবার সবার মত নিয়ে খোকাকে সম্পাদক বানানো হয়।

খবরটা বাবা পেয়ে গেলেন। একদিন বললেন, 'খোকা দেখছি রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছ।'

খোকা বলল, 'আব্বা, আপানার আপত্তি থাকলে...'

খোকাকে পুরো কথা শেষ করতে দিলেন না বাবা। বললেন, 'শোনো, রাজনীতি কী? মানুষের সেবা করার একটা মাধ্যম। এই যেমন ধরো ডাক্তাররা কী করেন? মানুষের সেবা করেন। রাজনীতিও তাই। ডাক্তাররা মানুষের শরীরের অসুখ সারান। আর রাজনীতিবিদরা সমাজের, দেশের অসুখ সারান। দেশের মঙ্গল চিন্তা করেন। কাজেই রাজনীতি খারাপ কিছু নয়। আমি তোমাকে রাজনীতি করতে বাধা দেব না। তবে বাবা, সবসময় মানুষের ভালো চাইবে।'

বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খোকা। যদিও ওর ভালো কোনো কাজে কখনো বাধা দিতেন না বাবা। তাই বলে ওর রাজনীতি করাটাকেও এত সহজভাবে মেনে নেবেন, বুঝতে পারেনি। রাজনীতির প্রতি মুসলমানদের এমনিতেই অনীহা। ছাত্রদের জন্য তো রাজনীতিতে আসা আরো বেশি কষ্টকর। পরিবারের বাধা তো আছেই, মুসলমান শিক্ষকরাও বেশিরভাগ ছাত্রদের রাজনীতি করা পছন্দ করেন না। অনেক শিক্ষক প্রকাশ্যে তাঁদের মতামতও দিয়েছেন। একেবারে স্পষ্ট করে বলেছেন, ছাত্ররা কেন রাজনীতি করবে? ওদের রাজনীতি করার কী দরকার?

ওদিকে দশ বছর আগেই কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি। বাঙালি ছাত্রদের প্রথম কোনো সংগঠন। ওই সংগঠনে উৎসাহ জুগিয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুসহ অনেক খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ। কংগ্রেসের দেখাদেখি আর নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকা শহরের কয়েকজন মুসলিম বুদ্ধিজীবীও মুসলমান ছাত্রদের একটা সংগঠনের অভাব বোধ করছিলেন। ১৯৩২ সালে গঠিত হয় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতি। যদিও অনেক আগে থেকেই ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লে. কর্নেল এইচ সোহরাওয়ার্দী। তিনি সবসময় মুসলিম ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন। ১৯৩৮ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নতুন নাম হয় অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ। পুনর্গঠিত এ সংগঠনের সভাপতি ছিলেন ঢাকার আবদুল ওয়াসেক ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যশোরের শামসুর রহমান। এ ছাত্রসংগঠনই পূর্ববাংলার মুসলিম ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে আগ্রহী করে তোলে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান আন্দোলনে ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণও নিশ্চিত করেছিল সংগঠনটি।

যেখানে প্রায় সব অভিভাবক আর শিক্ষক ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে, সেখানে খোকার বাবা অন্যরকম। উল্টো খোকাকে নিরুৎসাহ তো করলেনই না, বরং উৎসাহ দিলেন। কজন ছেলের ভাগ্যে এমন বাবা জোটে?

তবে সবশেষে একটা কথা বললেন বাবা। বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'খোকা, আর যাই করো বাবা, লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে। এ জায়গাতে বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না।'

সত্যি তখন লেখাপড়ার প্রতি খোকার আগ্রহও বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। এমনিতেই অসুস্থতার জন্য কয়েকটা বছর নষ্ট হয়েছে। আর সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। নিজে থেকেই মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল খোকা। এছাড়া সময়ও নেই। আগামী বছরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে খোকা। এখন পুরোদমে শুধু লেখাপড়া আর লেখাপড়া। উঁহু। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও হঠাৎ ঝোঁক বেড়ে গেলে খোকার। তুমুল ঝোঁক।

৩০

ফুটবল খেলা নিয়ে বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল গোপালগঞ্জে। বাপ-ছেলের ছিল নিজস্ব ফুটবল দল। সেই ফুটবল দল দুটোর মধ্যে আবার ফুটবল খেলাও হতো। রীতিমতো ফুটবল প্রতিযোগিতা! গোপালগঞ্জের মানুষ অনেক অনেক দিন মনে রেখেছিল সে সময়ের কথা।

খোকার ফুটবল দলের নামডাক তো অনেক আগেই ছড়িয়েছে। এখানে ওখানে ওই টিম নিয়ে ফুটবল খেলেও বেড়ায় খোকা। ততদিনে মিশন স্কুল দলের অধিনায়ক হয়ে গিয়েছে ও। মহকুমায় যারা ভালো ফুটবল খেলত, তাদের এনে ভর্তি করিয়ে দিত মিশন স্কুলে। শুধু তাই নয়, ওদের বেতনও ফ্রি করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

যদিও হার্টের রোগ ছিল খোকার। তবু ফুটবল নিয়ে মাতামাতির কমতি ছিল না। তবে হার্টের রোগের জন্য বাবা ওকে বেশি খেলতে দিতে চাইতেন না। খোকার বাবাও ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। গোপালগঞ্জের অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন শেখ লুৎফর রহমান। ওই অফিসার্স ক্লাবেরও একটা ফুটবল দল ছিল। মাঝে মাঝেই অফিসার্স ক্লাবের সঙ্গে খেলা হতো মিশন স্কুলের। বাপ-ছেলের এই একে অন্যের বিপক্ষে ফুটবল খেলা—বেশ উপভোগ করত গোপালগঞ্জের মানুষ। বাপ-ছেলের খেলা হলেই যেন মাঠে উপচে পড়ত মানুষ।

১৯৪০ সালের কথা। এ জেড খান শিল্ডের ফাইনাল খেলা। একের পর এক খেলা হচ্ছে। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। ওদিকে অফিসার্স

ক্লাবের তো টাকার কমতি ছিল না। খেলার জন্য বাইরে থেকে খেলোয়াড় আনত ভাড়া করে। যেনতেন খেলোয়াড় নয়, সবই নামকরা খেলোয়াড়। তবু মিশন স্কুলের সঙ্গে পেরে উঠত না অফিসার্স ক্লাব। তো বছরের শেষদিকের প্রতিযোগিতা। টানা পাঁচটা ম্যাচ ড্র হয়। টানা খেলতে খেলতে স্কুলের ছাত্ররা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ক্লান্তি ছিল না অফিসার্স ক্লাবের। কী করে থাকবে? নিজেরা খেললে তো ক্লান্ত হবে। ওদের তো সব খেলোয়াড়ই আমদানি করা। কিন্তু টানা পাঁচদিন ড্র হলো। কোনো বিজয়ী তো ঠিক হলো না। পঞ্চম খেলাটাও ড্র হওয়ার পর, মাঠেই খোকার বাবা বললেন, 'কাল সকালেই খেলা হবে। জয়ী দল নির্ধারণ হওয়া দরকার।'

খোকা বলল, 'আপনাদের আর কী আব্বা। আপনারা তো কেউ নিজেরা খেলেন না। আমার দলের ছেলেরা এখন ক্লান্ত। কিছুদিন পর না হয় খেলা হোক।'

কিন্তু কিছুদিন পর তো ছেলেগুলো আবার হারানো শক্তি ফিরে পাবে। তখন ওদের হারানো যাবে না। তার চেয়ে ক্লান্ত থাকতে থাকতে খেলাটা খেলিয়ে নেয়া দরকার। অফিসার্স ক্লাবের ইজ্জত বলে কথা।

বাবা আশ্বস্ত করলেন, 'শোনো খোকা, এবার আর বাইরের খেলোয়াড় থাকবে না। অনেক খরচ। এত খরচ পোষানো সম্ভব নয়। অফিসার্স ক্লাবের সদস্যরাই খেলবেন। তবে খেলাটা কাল সকালেই হবে।'

বাবাকে বোঝাল খোকা, 'কিন্তু আব্বা কাল সকালে তো আমাদের পরীক্ষা। পরীক্ষা বাদ দিয়ে আমার দলের কেউ খেলতে যাবে না। খেলতে হলে আজকেই খেলতে হবে।'

বাবা এবার ছুটে গেলেন গোপালগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারির কাছে। বললেন, 'খোকাকে বোঝাও। খেলাটা যেন কাল সকালেই খেলতে রাজি হয়।'

সেক্রেটারি এলেন খোকার কাছে। জানালেন খেলার কথা। কিন্তু খোকা কোনোভাবেই খেলতে রাজি হলো না।

বাপ-বেটার কাছে কয়েকবার ছোটাছুটি করে বড্ড বিরক্ত হলেন সেক্রেটারি। বললেন, 'ধ্যাত্তেরি! এটা এখন দেখছি তোমাদের বাপ-বেটার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আর ছুটতে পারছি না। তোমরা যা খুশি করো গিয়ে।'

এবার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে খবর পাঠালেন বাবা। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসরঞ্জন সেনগুপ্ত। খোকাকে প্রাইভেটও পড়াতেন। খবর

পেয়েই ছুটে এলেন। এসে দেখলেন দলবল নিয়ে খোকা মাঠের এক গোলপোস্টে। আর খোকার বাবা তাঁর দল নিয়ে মাঠের অন্য গোলপোস্টে। খোকার দল চাইছিল সেদিনই খেলা হোক।

প্রধান শিক্ষক বোঝালেন খোকাকে, 'মুজিব, তোমার বাবার কাছে হার মান। আগামীকাল সকালেই খেল। অসুবিধা ওদেরই হবে। তোমাদের হবে না।'

খোকা বলল, 'স্যার, খেললে আজকেই। কারণ কাল সকালে আর আমরা খেলতে পারব না। আমাদের দলের সবাই ক্লান্ত। আমরা সারা বছর খেলেছি। সবারই পায়ে ব্যথা। দু-চারদিন বিশ্রাম দরকার। নয়তো আমরা হেরে যাব।'

ওই বছর একটা খেলাতেও হারেনি খোকার দল। আর এখন বছর শেষে এসে এ জেড খান শিল্ডের এই শেষ ফাইনালে হেরে যাবে? অসম্ভব।

এই এ জেড খান ছিলেন গোপালগঞ্জের এসডিও। তাঁর নামেই খেলা। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারছিল না খোকা।

প্রধান শিক্ষক আবারও বোঝালেন, 'দেখো খোকা, উনি তোমার বাবা। বাবার সঙ্গে একগুঁয়েমি চলে না। তোমার বাবা যখন চাইছেন, কাল সকালেই না হয় খেলো। আর উনি তো বলেছেনই, এবার আর বাইরের খেলোয়াড় থাকবে না। আর আমারও মনে হচ্ছে, কাল সকালে খেললেই তোমাদের ভালো হবে।'

আর গোঁ ধরে থাকা যায় না। দলবল নিয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এলো খোকা। কাল সকালেই খেলা হবে।

এবং পরদিন সকালে দলবল নিয়ে মাঠে হাজির খোকা। মাঠে গিয়ে দেখে খোকার বাবা আরো আগে তাঁর দল নিয়ে মাঠে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। অফিসার্স ক্লাবের খেলোয়াড়দের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল খোকা। নাহ। বাবা কথা রেখেছেন। বাইরের কোনো খেলোয়াড় নেই। কিন্তু বল নিয়ে তাঁরা যেভাবে ছুটোছুটি করছেন, তাঁদের প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই বেশ চাঙ্গা মনে হচ্ছে। নিজের দলের দিকে তাকাল খোকা। গতকাল বিকেলে তো শুধু পায়ে ব্যথা ছিল, এখন সবার গায়েও ব্যথা। পায়ের ব্যথাও বেড়েছে অনেক। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই বেশ কষ্ট হয়েছে ওদের। কোনো রকমে শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে মাঠে নিয়ে আসতে পেরেছে। এই শরীর নিয়ে খেলবে কেমন করে ওরা?

দলের সবাইকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করল খোকা, 'বন্ধুরা! এ বছর কোনো খেলাতেই হারিনি আমরা। ওরা বাইরে থেকে নামি-দামি খেলোয়াড় এনেও

আমাদের হারাতে পারে নাই। আজও আমরা ওদের হারাব। কি, হারাতে পারব না?'

ততক্ষণে দলের কয়েকজন খেলোয়াড় মাঠেই শুয়ে পড়েছে। নড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই। খোকার ডাকেই মাঠ পর্যন্ত এসেছে।

বড্ড হতাশ হলো খোকা। জানে না আজ খেলায় কী হবে। তবু একটা সান্ত্বনা যে ওদের বাইরের খেলোয়াড় নেই।

খেলা শুরু হলো। অফিসার্স ক্লাব যেন আজ অন্যরকম শক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। নাকি খোকার দল আজ শক্তি হারিয়ে মাঠে নেমেছে? খুব সাদামাটা বললেও ভুল হবে। বলতে গেলে খোকার দল তেমন খেলতেই পারল না। দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড় ইনজুরিতে থাকলে কোন দলটা ঠিকমতো খেলতে পারে? খোকারাও পারল না। ফলে যা হবার তা-ই হলো। বছরের শেষ খেলাটায় অফিসার্স ক্লাবের কাছে হেরে গেল খোকার দল। তা-ও সর্বনিম্ন গোলে। মাত্র এক গোল করতে পেরেছিল অফিসার্স ক্লাব। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত একটা দল পেয়েও মাত্র এক গোলই অনেক বড় কিছু ছিল অফিসার্স ক্লাবের কাছে।

শেষ খেলায় হেরে মন খারাপ করে মাঠে বসে রইল খোকা। খোকাকে সান্ত্বনা দিলেন অনেকে, 'হেরেছ তো কী হয়েছে খোকা। খুব ভালো খেলেই হেরেছ।'

অবাক হলো খোকা। বলল, 'ভালো আর খেললাম কোথায়? খেলতে না পেরেই হেরেছি। ভালো খেললে ওরা জিততে পারত? বাইরের খেলোয়াড় এনেও তো আমাদের বিপক্ষে জিততে পারেনি।'

আবারও সান্ত্বনা, 'থাক। হেরেছ তো কী হয়েছ। তোমার বাবার দলই তো জিতেছে?'

বাবার দল জিতেছে তো কী হয়েছে। খোকার দল তো জেতেনি। বড্ড আফসোস হলো খোকার। সারা বছর জিতে এসে, শেষ খেলাটায় হার। এ তো মেনে নেয়ার মতো নয়। স্কুলের ছাত্ররা বড় আশা করে ছিল। এ জেড শিল্ড ওরাই জিতবে। স্কুলের ছাত্রদের দিকে তাকাল খোকা। সবার মুখ মলিন হয়ে আছে।

দলের খেলোয়াড়দের দিকে তাকাল খোকা। শরীরের ব্যথা কোথায় চলে গেছে সবার? মনের ব্যথার কাছে শরীরের ব্যথা কিছুই না।

মাঠের অন্যদিকে তাকাল খোকা। ছেলেমানুষের মতো জয়ের আনন্দে হইচই করছেন শেখ লুৎফর রহমান। শুধু খোকার বাবা নন, অফিসার্স ক্লাবের

প্রায় সব খেলোয়াড় নাচানাচি করছেন খুশিতে। অন্য সময় হলে বাবার আনন্দে নিজেও ভাগ বসাত। আর এখন? বাবার দলের আনন্দটাকে ভালো লাগছে না খোকার দলের কারোরই। ওদিকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। অফিসার্স ক্লাবের সদস্যরা এর মধ্যেই মিষ্টিমুখ করা শুরু করেছে। করবে না! মিশন স্কুলকে হারানো, চাট্টিখানি কথা নয়। ওরে বাপরে!

৩১

দুপুর পেরিয়েছে সেই কখন! খোকার স্কুল ছুটি হয়ে গেছে ততক্ষণে। বড় রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালেন খোকার মা। কী ভীষণ রোদ আজ। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে দুপুর রোদে। রাস্তার ধারে একটা বড় আমগাছ আছে। ওই আমগাছের তলায় দাঁড়ালেন মা। এখান থেকে রাস্তাটা অনেক দূর অব্দি দেখা যায়। হুঁ। ওই তো খোকা আসছে। সঙ্গে দেখি আরো তিনজন। তবে কি আজও...? হোক। অসুবিধা নেই।

খোকাও জানে, এই আমগাছের তলায় এসে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকেন মা। ওর অপেক্ষায়। দূর থেকেই মাকে দেখে চওড়া একটা হাসি ফুটে উঠেছে খোকার মুখে। মায়ের কাছাকাছি আসতেই এক দৌড়ে চলে এলো। জড়িয়ে ধরল মাকে। খোকার মুখটা দুহাত দিয়ে ধরে মা বললেন, 'ইস। নিশ্চয়ই তোমার খুব খিদে পেয়েছে খোকা? চোখমুখ একেবারে বসে গেছে।'

'তা তো পেয়েছেই।'

'চলো। আজ তোমার পছন্দের কই মাছ ভাজা করেছি।'

'কই মাছ ভাজা!'

ভীষণ খুশি হয় খোকা। এরমধ্যেই আঁচল দিয়ে কপাল থেকে খোকার ঘাম মুছে দিয়েছেন মা।

'আমরা তাহলে যাই মুজিব ভাই।'

আরে! ওদিকে যে ওর তিন সহপাঠী দাঁড়িয়ে আছে, এতক্ষণ মনেই ছিল না ওদের কথা। খোকা বলল, 'যাবে আবার কী! চলো আমার সঙ্গে। কই ভাজা দিয়ে ভাত খাবে।'

'না, না আমরা বাড়িতে গিয়ে খাব।'

মা এবার ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকালেন। ওদেরও চোখ-মুখ

শুকনো। নিশ্চয়ই খিদের কারণে। কে জানে কত দূরে বাড়ি ওদের। যেতে নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ লাগবে।

খোকা বলল, 'আবার বাড়িতে গিয়ে খাবে মানে? আমার সঙ্গেই খেয়ে নাও। খেয়ে দেয়ে বিকেলে খেলতে বেরোব। চলো, চলো।'

মা-ও এবার গলা মেলান খোকার সঙ্গে, 'হ্যাঁ, বাবা, চলো। তোমরাও চলো।'

এবার খোকা আর মায়ের পিছন পিছন আসতে থাকে ওরা। মায়ের কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে জানতে চায় খোকা, 'বেশি করে ভাত রান্না করা আছে তো আম্মা?'

'তোমার কী মনে হয় খোকা? তোমার আম্মা বুঝি তোমাকে বোঝে না? পাঁচজনের খাবার বেশি আছে।'

এবার খুক খুক করে কেশে খোকা বলল, 'আর কই মাছ?'

'আমি বুঝি ওদের শুধু ভাত খেতে দেব?'

'আমার আরো দুই বন্ধু একদিন আপনার হাতের রান্না খেতে চায়। নিয়ে আসব একদিন?'

'কালই নিয়ে এসো। ওদের জন্য বিশেষ কিছু রান্না করব।'

'আমার জন্য বিশেষ কিছু রান্না করবেন না আম্মা?'

স্কুল খোলা থাকলে প্রতিদিন দুপুরে চার-পাঁচজনের জন্য বেশি রান্না করেন মা। স্কুল বন্ধ থাকলেও মাঝে মাঝে করতে হয়। হোস্টেলে যে ছেলেরা থাকে, ওদের বাড়িতে ডেকে এনে ভালোমন্দ খাওয়ায় খোকা। মা কিন্তু রাগ করেন না। একটুও রাগ করেন না। এমনকি বাবাও রাগ করেন না।

সবাইকে এক সঙ্গে খাবার দিয়ে হঠাৎ মা জানতে চাইলেন, 'খোকা, এই রোদের মধ্যে অত দূর থেকে হেঁটে আসলে যে। তোমার ছাতা কোথায়?'

ভাজা মাছের একটা পিঠ থেকে কিছুটা মুখে পুরে নিয়ে খোকা বলল, 'ছাতাটা আজ একজনকে দিয়ে দিয়েছি। ওর কোনো ছাতা নেই। কত দূর থেকে আসে! আমার তো এইটুকুন পথ।'

মা আর কিছু বললেন না।

রাতে বাবাকে বললেন মা, 'একটা ছাতা লাগবে। খোকার ছাতা নেই।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'গত পরশুই তো একটা ছাতা কিনে দিলাম। সেটা কোথায়? হারিয়ে এসেছে নাকি দিয়ে এসেছে?'

মা বললেন, 'খোকার ছাতা কখনো হারায় না।'

বাবা বললেন, 'তাহলে ঠিক আছে। যার দরকার তাকে দিয়েছে। এ আর এমন অসুবিধা কী।'

মা বললেন, 'কালই আনবেন। বৃষ্টিবাদলার দিন। নইলে স্কুল থেকে আসার সময় বৃষ্টি হলে বই-খাতা ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, কালই আনব।'

হঠাৎ পাশ থেকে হেলেন মনে করিয়ে দিল, 'মিয়া ভাইয়ের শার্টও লাগবে আব্বা।'

'শার্ট কেন আবার? ওর তো কয়েকটা শার্ট।'

'একটাও নেই আব্বা। দেখেন না খালি গেঞ্জি পরে ঘোরাঘুরি করে।'

'শার্টের কী হয়েছে আবার?'

'দিয়ে এসেছে।'

কথাটা শুনে খুব ভালো লাগল বাবার। খোকাটা বড্ড দিলখোলা। কারো কোনো অসুবিধা দেখলেই হলো, যেভাবেই হোক, উপকার করার চেষ্টা করবে। নিজের গায়ের জামা খুলে দিতেও দুবার ভাববে না। কয়েকদিন আগে একটা পাঠ্যবই দ্বিতীয়বার কিনে দিতে হয়েছে খোকাকে। ক্লাসে কে যেন বই কিনতে পারেনি, ওকে নিজেরটা দিয়ে দিয়েছে। আর প্রতি শীতে খোকার জন্য কয়েকটা চাদর কিনতে হয়। শীতে যারা কষ্ট পায়, তাদের দিতে হয় যে!

৩২

১৯৪১ সাল। কদিন পরেই খোকার ম্যাট্রিক পরীক্ষা।

খোকার দিকে তাকিয়ে মা অবাক হয়ে যান। এইটুকুন খোকা কত বড় হয়ে গেল! এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু খোকা যেরকম খেলাধুলা আর রাজনীতি নিয়ে পড়ে থাকে, পাস করবে তো?

খোকা জানে, ও পাস করবেই। ওর প্রস্তুতিও ভালো। রসরঞ্জন বাবুর কাছে ইংরেজি পড়ে প্রাইভেট। ইংরেজি নিয়ে ভয় নেই। ভয়টা গণিত নিয়ে। স্কুলের সেরা গণিত শিক্ষক মনোরঞ্জন বাবু। তাঁর কাছেই গণিত চর্চা করে খোকা। তবু গণিতকে ভীষণ ভয় ওর। ভয় তো হবেই। গণিতে এমন কিছু ছোট ভুল করে ফেলে খোকা, আর উত্তর মিলতে চায় না। খোকার বিশ্বাস ও প্রথম বিভাগ পাবে। কিন্তু গণিতের কথা মনে হলেই প্রথম বিভাগ পাওয়ার ব্যাপারে শঙ্কা জাগে।

ওদিকে পরীক্ষার একদিন আগেই ভীষণ জ্বর হলো খোকার। মামস হয়ে ফুলে গেল গলা। জ্বর উঠেছে একশো চার ডিগ্রি। সারা রাত খোকার পাশে বসে রইলেন বাবা। এর মধ্যেই গোপালগঞ্জ শহরের সব ডাক্তার ডেকে বাসায় এনেছেন বাবা। কিন্তু জ্বর কমছে না।

মা মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। জ্বর কমার নাম নেই।

পরদিনও বেশ জ্বর। সবাই চেষ্টা করছে খোকার জ্বর কমানোর। কিন্তু জ্বর ছাড়ছে না। বাবা বললেন, 'খোকা, এই জ্বর নিয়ে কি পরীক্ষা দেয়া ঠিক হবে? আমি বলি কি এ বছর বরং আর পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই। তুমি আগামী বছর পরীক্ষা দাও।'

'না। আমি এ বছরই পরীক্ষা দেব। এমনিতেই অনেকগুলো বছর নষ্ট হয়েছে। আর কত?'

'কিন্তু কিভাবে পরীক্ষা দেবে? জ্বরের জন্য তো মাথাই তুলতে পারছো না।'

'আমার জন্য বিছানার ব্যবস্থা করতে বলেন। শুয়ে শুয়ে হলেও পরীক্ষা দেব।'

অসুস্থতার জন্য বিছানার ব্যবস্থা করলেন বাবা। পরীক্ষা দিতে গেল খোকা। প্রথমদিন বাংলা পরীক্ষা। সকালে বাংলা প্রথমপত্র, আর বিকেলে বাংলা দ্বিতীয়পত্র। সকালের পরীক্ষায় বিছানা থেকে মাথা তুলতেই কষ্ট হয়েছে খোকার। শুয়ে শুয়ে যতটুকু লেখা যায়, লিখেছে। ভাগ্যিস বিকেলের দিকে জ্বর কিছুটা কমেছে। তাই বিকেলের পরীক্ষাটা মোটামুটি ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে অন্য পরীক্ষাগুলোও।

পরীক্ষা দিয়েই খোকা রাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে ভীষণভাবে। সভার আয়োজন করে, বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। খেলাধুলার দিকে আর আগ্রহ নেই তেমন। তখন খোকার মনপ্রাণ জুড়ে শুধু মুসলিম লীগ আর ছাত্রলীগ।

এর মধ্যে কলকাতা থেকেও ঘুরে এলো। কলকাতার বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অংশ নিল। কলকাতা থেকে ফিরে মাদারীপুর গেল। ওখানে গিয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করল।

ঘন ঘন কলকাতায় যাওয়া শুরু হয় খোকার। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে প্রায়ই যায়। দুজন মিলে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করে। সোহরাওয়ার্দীর স্নেহ খোকার মনে স্বপ্ন জাগায়। অনেক বড় স্বপ্ন।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেল। খোকা টেরই পেল না। পরীক্ষা তো ভালো হয়েছে। কিন্তু প্রথম বিভাগ থাকবে তো? খোকা জানে না।

একদিন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো। হুঁ। খোকা যা আশঙ্কা করেছিল, তাই হয়েছে। প্রথম বিভাগ পায়নি খোকা। পেয়েছে দ্বিতীয় বিভাগ। আর বাংলায় পেয়েছে সবচেয়ে কম নম্বর। বেশ মন খারাপ হলো খোকার।

বাবা বললেন, 'খোকা, কোনো কিছু নিয়ে মন খারাপ করতে নেই। তুমি যা স্বপ্ন দেখো, সেই স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাও। তোমার যা অর্জন তা নিয়েই এগিয়ে যাও।'

বাবার কথায় মনে সাহস পেল খোকা। ভীষণ সাহস। কিন্তু খোকার তো সাহসের কমতি ছিল না কোনোদিন। হঠাৎ কেন এমন হলো?

আসলে পরীক্ষার ফলাফলটাই খোকাকে কিছুটা ঘাবড়ে দিয়েছে। বাবার কথায় সাহস ফিরে পেয়েছে। আর অত ভাবনাচিন্তা করার সময় নেই। কলকাতায় গিয়ে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেল খোকা। থাকতে শুরু করল বেকার হোস্টেলে।

কলেজ থেকেই খোকার জীবনটা একেবারেই বদলে গেল। একেবারেই।

টুঙ্গিপাড়ার সেই খোকা আর এই খোকার মধ্যে অনেক পার্থক্য। টুঙ্গিপাড়ার দুরন্ত খোকা, বাড়ির ভাইবোনদের কাছে মিয়া ভাই—কলকাতায় এসে একেবারে মুজিব ভাই। কিংবা মজিবর। যদিও কলেজের খাতায় ওর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমান—নামটা মনে হলেই যে মানুষটার ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, সেই মানুষটা তখনও শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেননি। তবে হয়ে উঠছিলেন। প্রতিদিন একটু একটু করে। একটু একটু করেই একদিন তিনি হয়ে গেলেন মহীরুহ। বাঙালির মুক্তির নায়ক। এই হয়ে ওঠার জন্য কী পরিমাণ কষ্ট, ত্যাগ, কারাভোগ যে তাঁকে সইতে হয়েছে—সেটা ভাবনারও বাইরে। তাঁর সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত, তাঁর দূরদর্শিতা এবং মানুষকে ভালোবাসার যে ক্ষমতা—সেটা তিনি চেয়েছেন বলেই অর্জন করতে পেরেছেন। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির জন্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেনই, তিনি করতে পেরেছেন। তিনি চেয়েছিলেন বলেই সাতই মার্চের ভাষণের মতো একটা মহাকাব্য রচনা করবেন, তিনি পেরেছেন। তিনি পেরেছেন বলেই আজ আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ হতে পেরেছি।

কতদিন তো টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে আগের মতো থাকা হয় না তাঁর। টুঙ্গিপাড়ার সেই মেঘদলগুলো কি তাঁকে ভুলে গেছে অতদিনে? ১৯৭১ সালের সাতই মার্চ তাঁর সেই গর্জন কি ওরা শুনেছে?

৩৩

সেই তখন থেকে বুড়ো মেঘটা তাড়া দিচ্ছিল, 'জলদি চল। জলদি চল। নইলে জায়গা পাবি না।'

খিক খিক করে হেসে উঠল তরুণ আর ছোট মেঘেরা। এত বছর হয়ে গেল, ওরা এখনও সেই ছোট্ট মেঘই রয়ে গেল। আর সেই তরুণ মেঘই রয়ে গেল। বুড়ো মেঘ তো বুড়ো হয়েই থাকবে সারা জীবন।

খিক খিক হাসিতে রেগে গেল বুড়ো মেঘ। বলল, 'পারিস তো কেবল ওই একটা জিনিস—খিক খিক। খিক খিক। বলি এত খিক খিক করলে তৈরি হবি কখন। যাবি কখন। আর আমি বলে দিলাম, পরে গেলে কিন্তু জায়গা পাবি না। খোকাকে দেখতেও পাবি না কাছ থেকে। হুঁ। তখন আফসোস করেও লাভ হবে না।'

রেসকোর্স ময়দান থেকে নিদেনপক্ষে তিনশো মাইল দূরের ঘটনা।

অনেকগুলো ঢেউ জড়ো হলো এক জায়গায়। সবারই খুব ইচ্ছে তীরে গিয়ে আছড়ে পড়বে। সাগরের ঢেউ। একে একে জড়ো হলো ঢেউগুলো। তারপর পাক খেতে শুরু করল। পাক খেতে খেতে সবগুলো ঢেউ মিলে হয়ে গেল একটা ঢেউ। আর পাক খেতে খেতে সেই একটা ঢেউ হয়ে গেল অনেক উঁচু। ঢেউপর্বত। একেবারে আকাশসমান উঁচু। ঠিক তক্ষুনি একটা মেঘ যাচ্ছিল উড়ে উড়ে। কোথায় যাচ্ছিল? কোথায় আবার, রেসকোর্স ময়দানে! অনেকগুলো মেঘ খণ্ড মিলে যাচ্ছিল একই জায়গায়। একই পথে। আর যেতে যেতে সেই অনেক খণ্ড মেঘ মিশে গিয়েছিল। মিশে গিয়ে অনেক খণ্ড মেঘ হয়ে গিয়েছিল একখণ্ড অখণ্ড মেঘ। ওই অখণ্ড মেঘটা যাচ্ছিল সেই ঢেউ পর্বতের উপর দিয়ে। হঠাৎ নোনা পানির ছিটে লাগল মেঘের গায়ে। মেঘটা তো রেগে আগুন। চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কী করলি রে হতচ্ছাড়া?'

ঢেউ বলল, 'একটু দুষ্টুমি করলাম। দেখেছ, আমরাও মেঘ ছুঁতে পারি।'

মেঘ বলল, 'দুষ্টুমি করার আর সময় পাসনে? জানিস আমরা কোথায় যাচ্ছি? এ সময় পানির ছিটে মারলি?'

ঢেউ বলল, 'কিসের অত তাড়া তোমাদের? দলবেঁধে যাচ্ছো কোথায়?'

মেঘ বলল, 'রেসকোর্স ময়দানে।'

বলেই আর থামল না বিশাল মেঘটা। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ছুট দিল। অন্য সময় হলে বৃষ্টি হয়ে ঢেউকেও খানিক ভিজিয়ে দিত মেঘেরা। কিন্তু এখন

সময় নেই। তাছাড়া এখন দলের কোনো মেঘই বৃষ্টি হতে চাইবে না। বৃষ্টি হলেই তো ঝরে পড়তে হবে। ঝরে পড়া মানেই আবার সাগরে ফিরে যাওয়া। রেসকোর্স ময়দানে আর যাওয়া হবে না। আজ কেউ বৃষ্টি হতে চায় না। মেঘ হয়েই থাকতে চায় সবাই।

যেতে যেতে ওরা দেখল কত মানুষ! সাগরের পানির মতো মানুষ। বৃষ্টি ফোঁটার মতো মানুষ। পিঁপড়ার মতো পিল পিল করে চলছে মানুষ। অবাক হলো মেঘেরা। একটা মেঘ অবাক হয়ে বলল, 'এত মানুষ যাচ্ছে কোথায়?'

বুড়ো একটা মেঘ জবাব দিল, 'কোথায় আবার! আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই।'

পুঁচকে একটা মেঘ জানতে চাইল, 'ওখানে কী হবে?'

এই পুঁচকে মেঘগুলোকে নিয়েই যত জ্বালা। যেখানেই যাবে, কেবল এটা কেন হয়? ওটা কেন হলো? সেটা কে করল? আর যত আজগুবি জানতে চাওয়া। যত্তসব! ভীষণ বিরক্ত হলো একটা মাঝবয়েসী মেঘ। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল পুঁচকে মেঘটাকে, 'এত কথা বলিস কেন? চুপচাপ চলতে পারিস না?'

ওই পুঁচকে মেঘের চেয়ে খানিকটা বড় একটা মেঘ বলল, 'বড়রাই তো কথা বলছে। ছোটরা বললেই দোষ। হুঁহ্!'

তাই তো! এবার আরেকটা ছোট্ট মেঘের কথা শোনা গেল, 'বললেই হলো?'

ওর কথাটা কেউ বুঝল না। কী বললেই হলো? কেন বললেই হলো? আসলে ও কী বলতে চাইছে কেউ বুঝল না। কেউ জানতেও চাইল না, কেন ও কথাটা বলেছে।

আহা! ওদিকে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কখন যে রেসকোর্স ময়দানে যেতে পারবে! ভাগ্যিস এখন বসন্তকাল। মাঝে মাঝে উদাসী দমকা বাতাস আসে গড়িয়ে গড়িয়ে। তেমনি এক বাতাস এসে বিশাল অখণ্ড মেঘটাকে নিয়ে যেতে লাগল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। বসন্তকাল বলেই দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস তাড়া দেয় মেঘদের। দখিনা বাতাসেরা বসন্তকালেই মেঘদের নিয়ে খেলা করে বেশি। দখিনা বাতাসের ঝাপটায় কখন যে রেসকোর্স ময়দানের ওপর এসে দাঁড়ায় মেঘেরা, টেরও পায় না। একটা পুঁচকে মেঘ জানতে চায়, 'নিচে ওটা কী? সাগর?'

সঙ্গে সঙ্গে নিচে তাকায় সবগুলো মেঘ। আরে তাই তো! এ কোথায় এলো ওরা? নিচে যে আরেকটা সাগর! তবে কি বাতাসটা ওদের ভুল পথে নিয়ে এসেছে?

সবচেয়ে বুড়ো যে মেঘ, খক খক করে কাশতে কাশতে বলল, 'কেউ একজন নিচে গিয়ে দেখে আয়, আমাদের কোথায় নিয়ে এলো?'

মেঘের তরুণ দলটা ছিল আলাদা এক জায়গায়। ওখান থেকে এক তরুণ বলল, 'আমরা এসেছি রেসকোর্স ময়দানে। একটু পরেই শুরু হবে জনসভা।'

জনসভা! সেটা আবার কী জিনিস? পুঁচকে মেঘেরা তো এমন কথা কখনো শোনেনি। মিছিলের কথা শুনেছে, মিটিংয়ের কথা শুনেছে। একটা পুঁচকে মেঘ বলল, 'জনসভা কোথায় হয়? কেন হয়?'

ওরে বাবা! সেই মাঝবয়েসী মেঘটা এবার আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'সব সময় কেবল প্রশ্ন আর প্রশ্ন। প্রশ্ন ছাড়া দুনিয়ায় কী আর কিছু নেই?'

কে যেন বলে উঠল, 'আছে। প্রত্যেকটা প্রশ্নের কমসে কম একটা করে উত্তর আছে।'

সবাই তাকাল কথা বলা মেঘটার দিকে। একজন টিচার মেঘ। সাদা-কালো মিশেল। একই মেঘে সাদা-কালোর মিশেল খুব একটা দেখা যায় না। সাদা-কালো মেঘটার মুখে হাসি। হাসি হাসি মুখে বলল, 'ছোটদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। নইলে যে ওরা...'

কথাটা শেষ করতে পারল না মেঘটা। তার আগেই সেই খনখনে বুড়ো মেঘ চেঁচিয়ে উঠল, 'বলি হচ্ছেটা কী নিচে? জনসভা শুরু হলো?'

বুড়োর কথার জবাব দিল মাঝবয়েসী মেঘটাই, 'খানিক বাদেই শুরু হবে।'

বুড়ো বলল, 'তাহলে এবার চুপ করে থাক সবাই। তোদের বকবকানির জ্বালায় কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না।'

এবার চুপ হয়ে গেল সবাই। বুড়োকে সবাই ডরায়।

সবগুলো মেঘ তখন তাকায় মানুষসমুদ্রের দিকে। এত উঁচু থেকেও সাগরের কোনো তীর দেখতে পেল না কেউ। যে সাগর ওরা দেখে এসেছে, সে সাগরেরও তো তীর ছিল। এ সাগরের নেই কেন? এক-এক করে মানুষ আসছেই, আর বাড়ছে সাগরের পরিধি। তারপর হঠাৎ হইচই শুরু হলো নিচে। ভীষণ শোরগোল। মনে হলো সাগরের ঢেউ উত্তাল হয়ে পড়েছে। সেই উত্তাল ঢেউয়ের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন বিশাল এক মানুষ। বিশাল তার ছায়া। সেই ছায়া এসে পড়ল মেঘেদের গায়ে। চমকে উঠল মেঘেরা। যে সাগরের ঢেউ তারা দেখে এসেছে, এ ঢেউ যে তারচেয়েও বড়!

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সেই ছোট্ট মেঘগুলো, 'আরে! এ তো আমাদের খোকা। আমাদের টুঙ্গিপাড়ার খোকা!'

তরুণ মেঘেরাও তাকাল খোকার দিকে। বলল, 'হুঁ। একেবারে সত্যি। এ আমাদের খোকাই। কত বড় হয়ে গেছে খোকা। কত্ত বড়। আর আমরা মেঘেরা এখনও বড়ই হতে পারলাম না।'

খনখনে বুড়ো মেঘও দেখল খোকাকে। ভাগ্যিস খোকা তখন অনেক বড়। নইলে খোকাকে দেখতে পেত কি না সন্দেহ।

হঠাৎ পাশ থেকে আরেক খণ্ড মেঘ জানতে চাইল, 'তোমরা কি টুঙ্গিপাড়া থেকে এসেছ?'

'হুঁ। তোমরা?'

'আমার এসেছি ময়মনসিংহ থেকে। ওদিকে শুনেছি টাঙ্গাইল, রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, সিলেট থেকেও মেঘেরা এসেছে।'

আর তখনই হঠাৎ ভেসে এলো বিশাল এক ঢেউয়ের গর্জন—'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

নিচের দিকে তাকিয়ে আরো অবাক হয়ে মেঘেরা দেখল, ওই গর্জনে উত্তাল হয়ে উঠল লাখ লাখ ঢেউ, পুরো মানুষসমুদ্র।

মেঘজীবনে এমন গর্জন আর কখনো শোনেনি মেঘেরা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী—শেখ মুজিবুর রহমান
২. শেখ মুজিব আমার পিতা—শেখ হাসিনা
৩. ছেলেবেলায় শেখ মুজিব—বেবী মওদুদ
৪. রং রেখায় খোকার ছেলেবেলা—ফালগুনী হামিদ
৫. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে প্রকাশিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু গ্রন্থমালা
৬. বাংলাপিডিয়া
৭. ইন্টারনেট

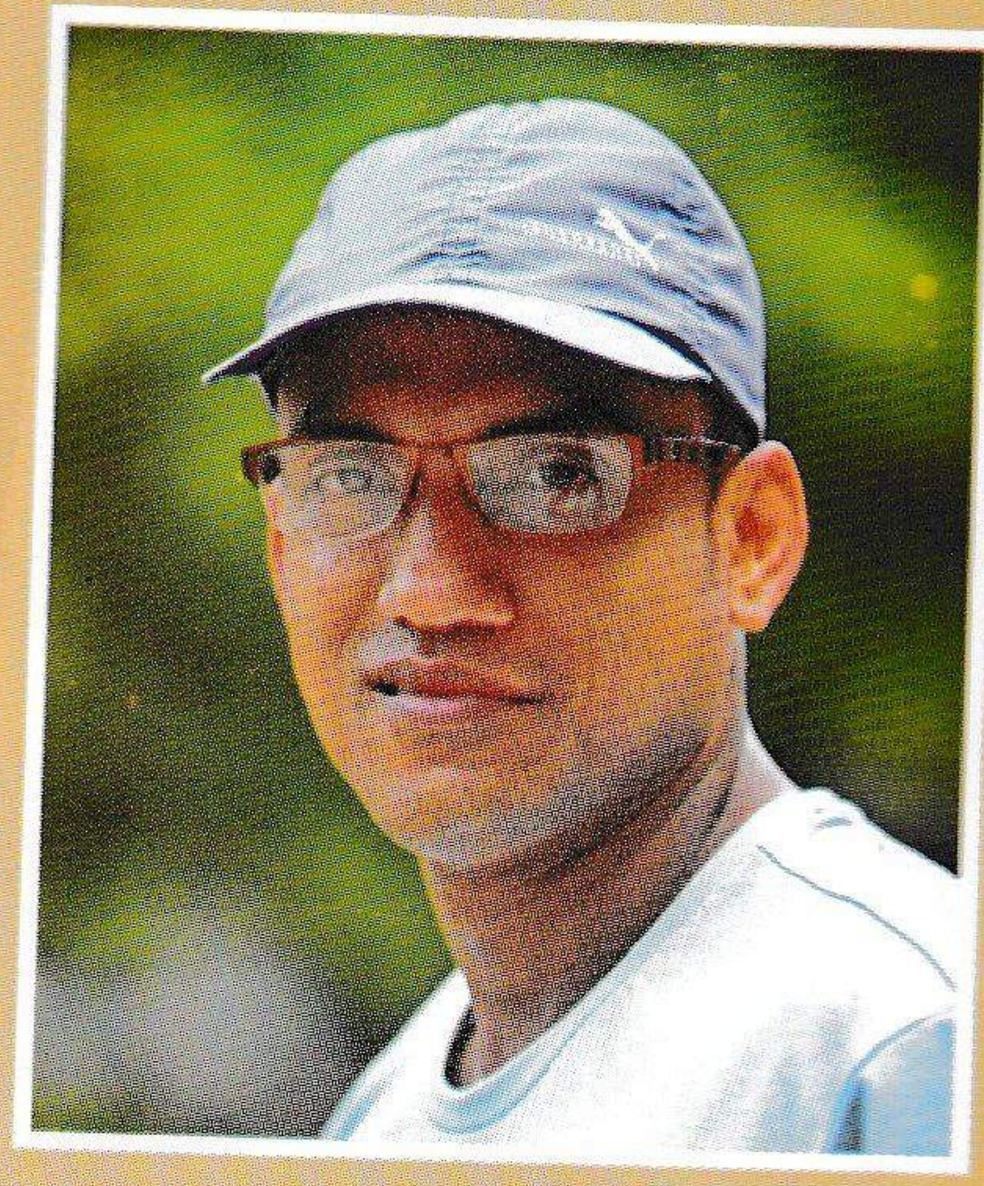

আলোকচিত্র : মোহাম্মদ

আহমেদ রিয়াজ

মূল নাম বি এম রিয়াজ আহমেদ। জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী জন্ম তারিখ ১৯৭৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। লিখছেন প্রায় তিরিশ বছর ধরে। কেবল পড়তে শিখেছে, এমন শিশুদের জন্য লিখছেন যুক্তবর্ণবিহীন গল্প। গল্পের জন্য তিনবার সৃজনশীল শাখায় মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন–২০১১, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে। বঙ্গাব্দ ১৪১৫-তে *আঙ্কেল গ্রেনেড ও তার দল* বইয়ের জন্য পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক-বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুসাহিত্য পুরস্কার। ২০১৪ সালে *হাঁসজারুদের গল্প* বইয়ের জন্য সাধারণ গদ্যে পেয়েছেন এম নুরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরস্কার। ২০১০ সালে দুই গোয়েন্দা এক রহস্য বইয়ের জন্য সেরা রহস্য ও ২০১৪ সালে *হাঁসজারুদের গল্প* বইয়ের জন্য পেয়েছেন পরিবেশ বিষয়ক সেরা লেখক হিসেবে ছোটদের মেলা পুরস্কার।

ভূমিকা

শব্দ চাষে দক্ষ চাষী

৫৭